ছাইলিপি ম্যাগাজিনের সাপ্তাহিক সংখ্যা

স্রোত

বর্ষ-০২| চৈত্র-১৪২৮ | মার্চ-২০২২ |

গদ্য-কাব্যে আবার শুরু

সুবীর মন্ডল
জোবায়ের রাজু
নিশিকান্ত রায়
মহীতোষ গায়েন
গোলাম কবির
গৌতম সরকার

সংখ্যা-১৯

ছাইলিপি

কবিতা

রঙ লেগেছে মনে

অশোক কুমার পাইক

রঙ লেগেছে মনে আমার, রঙ লেগেছে মনে,
ফাগুন বাতাস গোপন করে বইছে হৃদয়বনে,
শিমুল পলাশ কৃষ্ণচূড়ায় লালচে ভরা জ্যোতি
বসন্ত কোকিল মধুর গানে নাচায় মনের গতি।

পিছন থেকে কারা মোর আবির মাখায় গায়ে
কৃষ্ণ কেশে আবির মাখা নূপুর বাজছে পায়ে,
ভাঁজ করা মোর শুভ্র শাড়ি রঙিন রঙে ভরায়
হোলির রঙে শাড়ির ভাঁজে যেন চিকন ধরায়।

ও সখী তুই দেখনা চেয়ে খেলছি হোলি মেতে
হাতের কাঁকন নড়ছে সদা মনের মানুষ পেতে,
রঙ যে দেবো তার যে গায়ে উজল হাসি হেসে
আমায় সে যে আবির দেবে মধুর ভালোবেসে।

ঘরের ভিতর কারা বসে আয় রে ধুলার পরে
রঙিন রঙে খেলবি হোলি আনন্দে প্রাণ ভরে,
উথালপাতাল হৃদয় আমার বসন্ত এলো মনে,
প্রেম নিবেদন করবো আমি বসে গোপন বনে।

বনবনিয়ে ভ্রমর ওড়ে আসলো ফাগুন ফিরে
পাগল সবাই মধুর আশে ফুলের কানন ঘিরে,
সবুজ পাতায় রঙ ধরেছে ঘ্রাণে ভরায় মুকুল
বসন্ত আজ রঙ যে ধরায় ফোটে মনের ফুল।

হোলির রঙে ঢেউ যে খেলে ভিজে মাটির গন্ধ
ফাগুন মাসে বসন্ত আজ ফেরায় মনের ছন্দ,
উদার আকাশ মুক্ত বাতাস বইছে দিকে দিকে
আজ বসন্ত দেয় যে দোলা মনের মাঝে লিখে।

তোমায় আমায় খুশির দোলা পাগল করে মনে
সখীরে তুই আয় না কাছে লজ্জা জাগে ক্ষণে,
চিনতে আমায় কেউ পারে না রঙেই ভরা মুখ
অনুভূতির রঙিন দোলায় দুলছে আমার বুক!

দক্ষিণ ২৪ পরগণা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত।

হৃদয়ের স্বরলিপি

মহীতোষ গায়েন

কথা দিয়েছিলাম,রাখতে পেরেছি তাতে সুখশান্তি
আর কিছু পাওয়া না পাওয়া তাতে যায় আসে না,
অবিরাম ছায়ার সাথে হেঁটেছি,ছায়া দিয়েছে ক্লান্তি।
অবিরাম বৃষ্টিতে ভিজেছি,সে বৃষ্টিতে বিক্ষত তনুমন
অবিরাম আশা নিয়ে চলায় ঠকেছি,হোঁচট খেয়েছি,
অবিরাম ভালোবাসাহীন ফুলের সাথে তবু প্রতিক্ষণ।

কখনো কি কারোর মনে হয়নি যে,সহজ সরল মরে
একজন ভালো মানুষ সবার কাছে ঠকতে ঠকতে...
শেষে একদিন সে ভয়ঙ্কর জটিল হয়ে যেতে পারে!
আকাশে উঠেছে চাঁদ,আলোয় খুঁজেছি প্রেম-নুড়ি
কত গ্রীষ্ম পার করেছি বর্ষার জন্য,কত বর্ষা পার
করেছি শরতের জন্য,শিউলি-ডালে মরেছে কুঁড়ি।

হেমন্তের মাঠে মাঠে ঘুরেছি,ঝরা ফুল কুড়িয়েছি
শীতের শিশির গায়ে মেখে খুঁজেছি কাঙ্ক্ষিত সুখ,
বসন্ত বাতাসে বনফুল আজ খোঁপায় গুঁজে ঠকেছি।

কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত।

ছোটগল্প

আগামীকাল

আশিক মাহমুদ রিয়াদ

সুদেব কেঁদে দিলো। কি হয়েছে?, জানতে চাইলাম সুদেবের কাছে। ক্রদণ গলায় বললো, আমি একটা খুন করে ফেলেছি শফি ভাই।

যতুদুর মনে পরে একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস নিয়ে ঘুমাতে গিয়েছিলাম। আকাশ থমথমে.. দু এক পশলা বৃষ্টি গড়াতে পারে। রাস্তাঘাট ভিজে যবুথবু হতে পারে, ব্যবসায় লোকসান পড়তে পারে দোকানীদের। সারারাত ঘুম না হতে পারে ফুটপাতে ঘুমানো মানুষগুলোর। আপাতত এসব চিন্তা আমার মাথায় নেই। পাতলা কাথা মুড়ি দিয়ে ঘুমানোর চেষ্টা করছি বেশ কিছুক্ষণ ধরে। বাইরে আচমকা বিকট শব্দে বাজ পড়লো.. সাথে আকাশ থেকে ভেসে এলো গুরুম গুরুম শব্দ। বৃষ্টি আরও বাড়বে আন্দাজ করা যায়! শীতকালে এরকম অহেতুক বৃষ্টিপাত আর সাগরের নিম্নচাপ যেন পরিবেশের ওপর সচেতন হতে বলছে ।আমার বন্ধু রাকেশের কাছে পরিবেশ, সংক্রান্ত ব্যপার নিয়ে জিজ্ঞেস করলে ঠায় হেসে উড়িয়ে দেয় । বিড়ি খোরের কাছে নাকি পরিবেশের বাণী শোনা তার ঠ্যাকা পড়েছে ।

মোবাইল ঘেটে নিউজ দেখলাম.....সাগরের নিম্নচাপ ঘূর্ণিঝড়ে পরিণত হয়েছে। ফোন নিয়ে নাড়াচাড়া করতেও ভালো লাগছে না। উঠে আড়মোড়া ভেঙে টেবিলে গিয়ে বসলাম। এই বৃষ্টিস্নাত দিনে একটা লেখা না বের করতে পারলে বিকেলটা বৃথা। একটা গল্প লেখার চেষ্টা করছি..গতানুগতিক প্রেম-ভালোবাসার গল্প। লিখতে চাচ্ছি না.. তাও লিখতে হচ্ছে। সেই গল্প লেখা হলো না , মেস ম্যানেজার চক্রবর্তী বাবু এসে মেসের হিসেব নিয়ে আধাঘন্টা খানেক বয়ান দিয়ে গেলেন । যাওয়ার আগে অবশ্য আশ্বাস দিলেন , সন্ধ্যায় চা নাস্তা খাওয়াবেন। আমিও ফিকে হাসি হাসতে হাসতে, নিমন্ত্রণ গ্রহণ করলাম।

বিকেল নেমে যেন সন্ধ্যা গড়ালো খুব দ্রুত। আকাশে গুরুম গুরুম শব্দ, বৃষ্টি হচ্ছে কখনো মুষলধারে আবার কখনো অল্পস্বল্প। সন্ধ্যে হওয়া নাগাদ পেটের মধ্যে খিদের উপদ্রব টের পেলাম। গত সোমবার ছাতাটা শুধাকান্ত বাবুদের বাড়িতে ফেলে এসে মস্ত ভুল করেছি। অবশ্য সেই ভুলের কথা আগে তেমন একটা মনে ছিলো না, বৃষ্টি দেখে মনে পড়লো। মেসের একেবারে কর্ণারের ঘরটাতে সুদেব নামে একটি ছেলে থাকে। বাড়ি নাটোর জেলায়, ছেলেটি অত্যান্ত ভদ্র। যাকে বলে অতিশয় ভদ্রতরুণ। মাঝেমধ্যে ওর ঘরের গিয়ে বসা হয়, আড্ডা হয় প্রাণ খুলে। কখনো রাজনৈতিক আবার কখন আন্তর্জাতিক কিংবা মহাকাশীয় বিষয়বস্তু সম্পর্কে । এই আলোচনা কখনো জড়ায় তর্কে বিতর্কে। সুদেব যখন আমার উপর প্রশ্ন ছুড়ে দেয় এমন ভাবে, যে পরবর্তী পৃথিবী নাকি ইলন মাস্ক একাই শাসন করতে যাচ্ছে কি না? তখন আমার বলার আর কিছু থাকে না। আমি বলার খুঁজে পাই না। কখনো আড্ডা গড়া খেলার মাঠে, ফুটবল হোক কিংবা ক্রিকেট।

২.

সন্ধ্যেবেলা কাকভেজা হয়ে মেসে ফিরে দেখি সুদেব গেটের সামনে ঠায় দাঁড়িয়ে আছে। ছাতা বুজিয়ে সুদেবকে বললাম, বুঝলে সুদেব! এখন বাইরে টাইরে যেও না যেনো। রাস্তায় পানি উঠে গেছে, আজ রাতে জলছ্বাসের সম্ভাবনা প্রখর। তাছাড় রাস্তায় সাপখোপ দেখলাম দু একটা। এখন বাইরে যাওয়া ভীষণ রিস্কি ব্যাপার। সুদেবের গলায় চিন্তার স্বর টের পেলাম। কেমন নার্ভাসনেস নিয়ে বলছে, আমাকে তো বাইরে যেতে হবে এখনই। শফি ভাই আপনি ছাতাটা দিন আমায়।
আমি সুদেবকে জিজ্ঞেস করলাম, তোমার সিগারেট লাগলে নিও আমার থেকে। আর ঘরে চা পাতা আছে। এই ঝড়ের রাত দিব্যি চলে যাবে। আচ্ছা তুমি যেতে চাইলে যাও। ইলেকট্রেসিটি এখনও আছে, এখনও গেলো না কেনো সেটাই বা আশ্চর্যের কম কি?
সুদেব আমাকে বললো, আমার জ্যাঠামশাই অসুস্থ হয়ে পড়েছে। সেখানে যেতে হবে আমাকে। আপনি ঘরে যান। আমি পারলে আজ রাতেই ফিরবো।
সুদেবকে বিদায় দেওয়ার পরে ঘরে এসে কিছুক্ষণ বসতে না বসতেই আমার ঠান্ডা লেগে গেলো। একনাগাড়ে মিসাইলের মত কয়েকটা হাঁচি ছুঁড়ে দিলাম মেঝের দিকে। নাকের অবস্থা ভীষণ খারাপ।
কোল্ড এলার্জির সমস্যায় ভুগছি বেশ কয়েকদিন।
রাত গড়ালো, ঝড় বাড়লো ভীষণ। মেসের খাবার এনে ঘরে রাখলাম। আজ রাতটা ভীষণ উপভোগ করা যাবে বোধয়। শরীরে একটু একটু করে জ্বর উঠছে। রাত জাগা যাবে না, রাতের খাবার শেষ করে প্যারাসিটামল খেয়ে গা এলিয়ে দিলাম বিছানায়। আজ সারারাত বোধয় ভীষণ জ্বর উঠবে, সেই সাথে ঝড়ও বাড়বে ভীষণ।

৩.

জানলা থেকে বৃষ্টির ঝাপটা এসে ভিজিয়ে দিয়েছে সারাঘর। আমার ঘুম ভাঙলো, বাজ পড়ছে আশেপাশে, দিনের আলোর মত ফর্সা হয়ে উঠছে চারপাশ প্রকট শব্দে কানের তালা লেগে যাচ্ছে।
দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ শুনতে পাচ্ছি। টর্চ জ্বালিয়ে দরজার খিল খুলতেই ভেতরে এলো সুদেব। সুদেব ভিজে গেছে পুরোটাই। বাতাসের দমকা হাওয়া দরজায় বাড়ি খেয়ে দরজা ভেঙে যাওয়ার উপক্রম। দরজা লাগিয়ে সুদেবকে বললাম, এত রাতে এই ঝড়ের মধ্যে এলে কেনো? কাল সকালে এলেই পারতে। সুদেবকে ভীষণ অস্থির মনে হচ্ছে, আমার গামছাটা এগিয়ে দিলাম। সুদেব গামছাটা নিয়ে মুখ মুছলো। নিজের একটা লুঙ্গি দিলাম, সুদেব চেয়ারে বসে পড়লো ঠায়। তাকে বেশ চিন্তিত মনে হচ্ছে। ওকে জিজ্ঞেস করলাম, কোন সমস্যা হয়েছে সুদেব?
সুদেব ভীত গলায় বললো, আমি একটা মস্তবড় ভুল করে ফেলেছি শফি ভাই, এই বলে সে আমার হাত চেপে ধরলো শক্ত করে। সুদেব কেঁদে দিলো।
কি হয়েছে?, জানতে চাইলাম সুদেবের কাছে। ক্রদণ গলায় বললো, আমি একটা খুন করে ফেলেছি শফি ভাই।

আমি চিন্তিত হয়ে পড়লাম বেশ। এই সুদেবকে আজ ঝড়ের রাতে আমার ভীষণ অপরিচিত মনে হচ্ছে। সুদেবকে বললাম, এসব কি বলছো সুদেব? তোমার মাথা ঠিক আছে? সুদেব ঘটনা খুলে বললো আমায়।
ওর প্রেমিকার বিয়ে হয়েছে কয়েকদিন আগে। কয়েকদিন আগেই খোঁজ পেয়েছে, প্রাক্তন প্রেমিকা আর তার বর, সামনের দুটো গলি পেরিয়ে নীল কমল গলিতে একটি বাসায় থাকে। সুদেব আজ রাতে সুযোগ বুঝে প্রাক্তন প্রেমিকার স্বামীকে খুন করে এসেছে। সুদেব কেঁদে দিলো হাউমাউ করে। ক্রদণ কন্ঠে বললো, আমি ওকেও মেরে ফেলেছি। আমি সুদেবের কথা শুনে ঠায় দাঁড়িয়ে রইলাম। একজন সদ্য খুনী মানুষের সামনে আমি দাঁড়িয়ে। কেমন রঙমিশেল অনুভূতির পরিচয় পাচ্ছি।

সুদেব বলল, আমার ভীষণ ভয় করছে শফি ভাই। আমি এটা কখনোই চাইনি। কি থেকে কি হয়ে গেলো। আবছা অন্ধকারে টর্চের আলোয়ে সুদেবের মুখখানা দেখলাম আমি। এই নিষ্পাপ মুখখানাতে জমে আছে কত দুঃখ। সেই দুঃখ দেয়াল পেরিয়ে আজ তাকে পরিচয় দিয়েছে একজন খুনী হিসেবে। আজ সে আমার কাছে খুনী, কাল গোটা দেশের কাছে খুনী হয়ে যাবে। আমি ভীষণ চিন্তায় পড়ে গেলাম।কি থেকে কি করা যায় ভেবে পাচ্ছি না। কাল সকাল হলে কি হবে, ভেবে পাচ্ছি না কিছুই! বাইরে বাতাসের তান্ডব শুরু হয়ে গেছে। এই তান্ডব কখন থামবে কে জানে। আমি সুদেবের দিকে তাকাতে পারছি না। এ ঝড় থামলেই, অন্য এক ঝড় এসে পড়বে। সেই ঝড়ের তান্ডব কতদূর কে জানে।

শিল্পলিপি

আদ্যনাথ ঘোষ

অর্ধেকটা রেখে দিয়ে বাকি অর্ধেক উনুন জ্বেলে
অসমাপ্ত রাখিনিতো জল মাটি হাওয়া।
যতই লিখি ছাইলিপি, যতই লিখি জললিপি
কীভাবে যে লিখে ফেলি শিল্পলিপি মন!

আমার তোমার দেখা হলে
মাটি থেকে দেহ;
দেহ থেকে জল হাওয়া, ভেসে চলে রোদ।

কেমন করে জীবন চলে, কেমন মনের গতি
মানুষ যেমন কালি ও কলম
লিখে চলে ফুলে ফলে গোলাপ দুপুর ভরি!
তৃষাতুর গলি।

পাবনা, বাংলাদেশ।

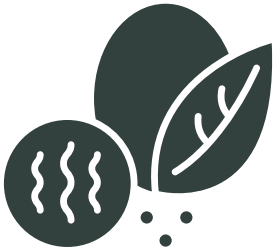

প্রিয় নদী, তোমাকে

গোলাম কবির

প্রিয় নদী,
তোমাকে নিয়ে লিখেছি
আমার কতো কবিতা!
আমার কতো অলস দুপুর কেটে গেছে
তোমার পারে বসে তোমায় ভেবে ভেবে,
দুরন্ত কৈশোর থেকে যৌবনের আগুন রাঙা
বসন্তের কতো কতো দিন কেটে গেছে
হায় তোমার বুকে ইচ্ছে মতো দাপিয়ে,
ভিজে চুপচুপে শরীর নিয়ে
লুকিয়ে মা'র দেখানো রক্তচক্ষুকে উপেক্ষা
করে চোরের মতো বাড়ি ফিরে।
আজো আমার হৃদয়ে প্রচণ্ড ভালবাসা
তোমার জন্য এবং এখনো অনেকে
ধন্দে থাকে আমার ভালবাসা
তোমার প্রতি বেশি নাকি প্রিয় নারীর প্রতি!
তা না হয় ওরা ধন্দেই থাকুক চিরকালই!
কিন্তু তবুও তোমাকে নিয়ে এখনো
আমার দীর্ঘশ্বাস গেলো না।
কি ভীষণ সুন্দর ছিলে তুমি!
আর আজ!
এখন তোমার দিকে তাকালে
আমার বুকের ভিতরে কেমন জানি
কষ্টরা দলা পাকিয়ে শুয়ে থাকে
অলস পাইথনের মতো,
ভীষণ ভাবে দম আটকে আসে!
মনেহয় তোমারও অশ্রুশূন্য চোখের জল
ফুরিয়ে কালশিটে দাগের চিহ্ন হয়ে
আমাকে কষ্ট দেয় তোমার শীর্ণ শরীর!
তোমার ভীষণ শীর্ণকায় শরীর দেখে
আমার কেবলি মনে পড়ে পথের ধারে
বসে থাকা বৃদ্ধা ভিক্ষুক বুড়ি'মার কথা!
তোমার গায়ের কালো জল দেখে
এখন নোংরা নর্দমার দূষিত জলের
দুর্গন্ধ ছাড়া আর কিছুই পাইনা খুঁজে!
মনে পড়ে - একটা সময় ছিলো,
যখন এই আমিই, কতোদিন তোমার
টলটলে জলে নিজেকে দেখেছি
মজা করে আয়না ভেবে ভেবে!
এখন তুমি শুধুই আমার ভালবাসার
দীর্ঘশ্বাস ও আর্তনাদে মিশে আছো,
মিশে আছো যেনো হৃদয়ের
গভীরতম ক্ষত হয়ে আমৃত্যু!

ঢাকা, বাংলাদেশ।

ছোটগল্প

সাবান

জোবায়ের রাজু

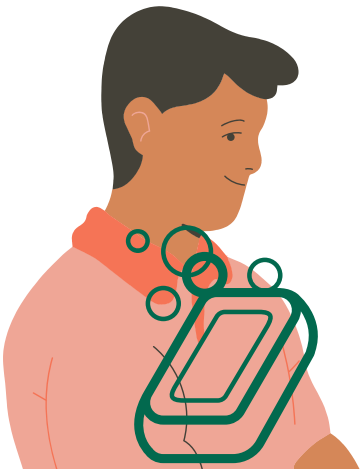

বাবা ঘরে সাবান আনলে মা সেটা মাঝখান দিয়ে দুইভাগ করলে আমরা ভাইবোনেরা ক্ষিপ্ত গলায় বলতাম, 'এটা কোনো কাজ হলো?' মা আমাদের কথার তোয়াক্কা না করে তরল গলায় বলতেন, 'এই সংসারে যেদিন সুদিন ফিরবে, সেদিন তোরা পুরো সাবান পাবি!' আমরা আর কথা বাড়াই না। মা আমাদের 'ঘর' নামক ভাঙা তরীর দক্ষ মাঝি। ছোটবেলা থেকে দেখে এসেছি এই অভাবের সংসারে আমাদের বড় দুর্গতি। বাবা স্কুলের স্বল্প বেতনের দপ্তরি। নুন আনতে পান্তা ফুরায় সংসারের আমরা তার চার ছেলে।

চৌধুরী বাড়ির সামনে বিশাল দিঘি। সেই দিঘির শান বাঁধানো ঘাটে দশ গেরামের মানুষ স্নান করতে আসে। স্কুল থেকে ফিরে রোজ দুপুরে আমি চৌধুরী বাড়ির দিঘিতে স্নান করতে গেলে দশজনে আমার অর্ধেক সাবান দেখে তাচ্ছিল্যের হাসি দেয়। তারা যে ধনী। আমাদের মত গরীব হলে বুঝতো অর্ধেক সাবানের তাৎপর্য। একদিন মাকে বললাম, 'সাবান আর দুইভাগ করো না, লোকে হাসে।' গালে ঠাস করে চড় বসিয়ে দিয়ে মা বললেন, 'লোকে কি তোরে সাবান কিনে দেয়?' সেদিন বুঝতে পেরেছি অভাবের কাছে আমরা চির অসহায়। ঘরে সাবান ফুরালে বাবা সাবান কিনে আনলে মা সেই সাবান দুইভাগ করে একভাগ আলমারিতে ভরে রাখেন। অর্ধেক ভাগেরটা শেষ হলে বাকিটা বের করেন। এইসব ঘটনা মনে করিয়ে দেয় আমরা খুব গরীব। কবে আসবে সুদিন!

যখন আমাদের সুদিন হাতছানি দিচ্ছে, তখনই মা চলে গেলেন ওপারের শেষ ডাকে। মনে আছে মাকে যখন শেষ গোসল করানো হবে, বাজার থেকে আনা হয়েছে লাক্স সাবান। সেই সাবান দিয়ে মাকে গোসল করানো হলো। মা সেই সাবান দুইভাগ করার তাগিদ না দিয়ে চিরনিদ্রায় শুয়ে রইলেন। জীবিত থাকলে আমি নিশ্চিত মা ওই লাক্স সাবান দুইভাগ করে একভাগ আলমারিতে রেখে দিতেন।

২.

তারপর বয়ে গেল দিনের পরে দিন। সুখের সন্ধান মেললো আমাদের। কুঁড়েঘর ছেড়ে দালান ঘরে ওঠার দুইমাস পর বাবাও চলে গেলেন মায়ের কাছে। একে একে সংসার হলো আমাদের চার ভাইয়ের। অভাবের দিন শেষে আমাদের জীবনে সুখ সখ্যের আহ্বান।

সেদিন বাথরুমে ঢুকতেই দেখি সেখানে নতুন একটি সাবান। অর্ধেক নয়। পুরোটা। এই সাবান দুইভাগ করা হয়নি। স্ত্রী তামান্নাকে ডেকে বললাম, 'ছুরি এনে দাও!' সে ছুরি এনে দিলো। সাবানটি মাঝখান দিয়ে দুইভাগ করতেই তামান্না চেঁচিয়ে বলল, 'এটা কোনো কাজ হলো?' আমি কাঁপন গলায় বললাম, 'এই ঘরে সারাজীবন সাবান ব্যবহার করতে হলে অর্ধেক করে কেটে তারপর ব্যবহার করতে হবে!' তামান্না আমার কথাকে তোয়াক্কা না করে উপহাসের হাসি দিলো। সে তো জানেনা এই পরিবারে অর্ধেক সাবানের অতীত ইতিহাস। জানালা দিয়ে বাইরের অদূরের মায়ের কবরের দিকে তাকালাম কাতর চোখে। আমার খুব জানতে ইচ্ছে করলো মা কি ওপারের স্বর্গে এখনো সাবান দুইভাগ করেন!

সেদিন বাথরুমে ঢুকতেই দেখি সেখানে নতুন একটি সাবান। অর্ধেক নয়। পুরোটা। এই সাবান দুইভাগ করা হয়নি। স্ত্রী তামান্নাকে ডেকে বললাম, 'ছুরি এনে দাও!' সে ছুরি এনে দিলো।

আমিশাপাড়া, নোয়াখালী।

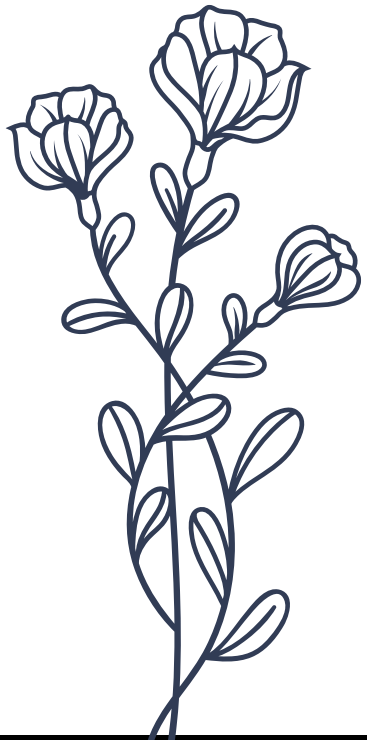

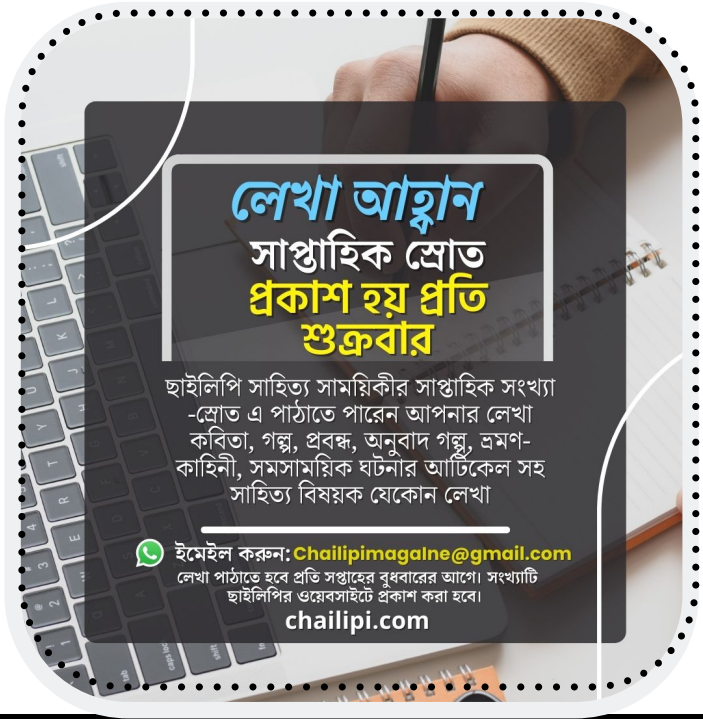

ছাইলিপি

গল্প-কল্প

হোটেল রতন প্যালেস

শুভাঞ্জন চট্টোপাধ্যায়

'বেশ্যা বাড়ির আতর মেখে কেউ বা কারা তাহলে এ ঘরে এসেছিল... আমরা আসার জাস্ট কিছু আগেই..। আবার এমনও হতে পারে, খানদানি পাবলিক... চোখে সুরমা, গায়ে আতর ছিটিয়ে...। যতই যা বলো জায়গাটার রক্তেই কেমন একটা...!

আটের দশকের একেবারে প্রথম দিক। স্কুলের কয়েকজন কলিগ মিলে বোম্বে, গোয়া হয়ে ঔরঙ্গাবাদ এসেছি বেড়াতে। এখানে এক দিন কাটিয়ে অজন্তা ইলোরা দেখতে বেরোবো..এভাবেই সিডুল করা প্রোগ্রাম।

স্টেশন থেকে ওয়াকিং ডিস্টেন্স এর মধ্যে একটা হোটেলের একতলার পাশাপাশি দুটো ঘর পেয়ে গেলাম আমরা। বেশ বড় মাপের সুদৃশ্য হোটেল। একতলায় পরপর চারটে ঘর। আমাদের ঘর গুলো সত্যিই বেশ বড়। তার পাশের দুটো ঘর তালাবন্ধ। সামনে একটা করিডর। মেইন গেট। গেট ছাড়ালে সবুজ ঘাসে ঢাকা লন। অনেকগুলো রঙবেরঙের ফুলের বাগান। মাঝখান দিয়ে বেশ যত্ন করে তৈরি করা নুড়ি পাথর বিছানো রাস্তা, মানে এ হোটেলে ঢোকার প্রবেশ পথ। মেইন গেট দিয়ে ঢুকে বেশ অনেকটা দূরে করিডোরের ডানদিকের এক কোণায় ম্যানেজার,কেয়ারটেকার এর ঘর।

রং, এবং কনস্ট্রাকশন দেখলে মনে হয় না খুব বেশিদিন আগের হোটেল এটা। দোতলার কনস্ট্রাকশন এখনো অর্ধেকটা হয়ে পড়ে রয়েছে, বাইরে থেকেই দেখা যায়। রাস্তায় নামলেই দূরে পাহাড়ের ওপর দৌলতাবাদ ফোর্ট চোখে পড়ে। সেদিকে তাকিয়ে বন্ধু অরূপ বলছিল আমায়,'দূর্গের যেটুকু অংশ চোখে পড়ছে...দেখলেই মনে হয় এ বহুকাল আগের। লক্ষ্য করেছো, ঠিক যেন ত্রিভুজাকৃতির একটা মাটির ঢিবির মতো...এত দূর থেকে... তাতেই মনে হচ্ছে কত উঁচু আর সুবিশাল পাঁচিল দিয়ে ঘেরা...!'

' ওগুলো পাঁচিল নয়, পরিখা। এখান থেকে ষোলো কিলোমিটার দূরে গেলে তবেই ঐ গ্রাম,পাহাড়। সেভাবেই চিন্তা করো জিনিসটা। দূর্গের গোটা স্ট্রাকচারটা লাল বেলেপাথরে তৈরি..আমার জামাই বাবু অনেককাল আগে ঔরঙ্গাবাদ বেড়াতে এসেছিলেন...তাঁর মুখে ঐ দূর্গের বর্ণনা শুনেছিলাম...সত্যিই মনোমুগ্ধকর! '

' কিরকম একটু বলো না...!'

অরূপের গলায় আগ্রহের সুর।

অনেক বছর আগে শোনা হলেও কথাগুলো যেন নতুন করে জাগিয়ে তুলছিল আমায়। পাঁচ কিলোমিটার বিস্তৃত ছয় থেকে নয় ফুট চওড়া দূর্গ বেষ্টিত প্রকান্ড প্রাকার, সুড়ঙ্গের মতো প্রবেশপথ, বিশালাকৃতির খিলান,গম্বুজ, তোরণ দ্বার, নিজামশাহী আমলের সুউচ্চ চাঁদমিনার, শত্রুপক্ষকে দিগভ্রান্ত করার উদ্দেশ্য নিয়ে আশ্চর্য কৌশলে তৈরি একের পর এক মিথ্যা দরজা, চোরকুঠুরি, বাঁকানো দেওয়াল, প্রবেশপথের ধারে দেওয়ালের প্রতিটি প্রকোষ্ঠের ফাঁকে ফাঁকে খুপরি খুপরি ঘর...যার ভেতর থেকে নিঃশব্দে খাঁড়ার ঘা এসে মুণ্ডচ্ছেদ করে ফেলতো শত্রুসেনার আর ধড় থেকে মাথাটা আলাদা হয়ে ছিটকে পড়তো অনেক নীচে সরোবরের জলে...গুপ্তহত্যার রক্তে কত সহস্র বার যে লাল হয়ে উঠেছে সে জল....এ সেই সরোবর, যেখানে মাংসলোলুপ কুমীরের দলকে ছেড়ে রাখা হতো অচেনা পথে আত্মরক্ষার্থে জলে ঝাঁপ দেওয়া শত্রুপক্ষকে টোপ হিসেবে ব্যবহার করবার জন্য...দূর্গের অভ্যন্তরভাগে সিঁড়ি বরাবর নেমে আসা সুড়ঙ্গপথের ধারে সম্রাট ঔরঙ্গজেব নির্মিত সেই দূর্ভেদ্য কারাগার যেখানে আহমদনগরের সুলতান আবুল হাসানকে বছরের পর বছর বন্দী করে রাখা হয়েছিল, নিষ্ঠুরতার দৃষ্টান্ত স্থাপনে সেও বা কম কি! যাদব বংশের রাজাদের হাতে গড়া সে দূর্গ এবং তার প্রতিরক্ষার এই অত্যাশ্চর্য আয়োজন হিন্দু রাজত্ব থেকে শুরু করে সুলতান আলাউদ্দিন খিলজির দেবগিরি বিজয়, মহম্মদ বিণ তুঘলকের সাধের দৌলতাবাদ, নিজাম শাহী বংশের রাজধানী শহরের মান-মর্যাদা ও তার সমস্ত গৌরবের প্রাণকেন্দ্র হয়ে যুগে যুগে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে রয়েছে আজও ঐ কচ্ছপাকৃতির পাহাড়ের গায়ে...লাল, হলদেটে বিবর্ণপ্রায়, ভাঙাচোরা বেলে পাথরের পরতে জড়ানো সে রোমাঞ্চ,নিষ্ঠুরতায় সমৃদ্ধ, বিস্ময়কর, গা ছমছমে ইতিহাসের কাহিনী বড় জামাইবাবুর মুখনিঃসৃত কাহিনির জলজ্যান্ত প্রতিচ্ছবি হয়ে দিনের আলোয় বহুদূরে একাকি পাহাড়ের কোল বেয়ে যেন বিচ্ছুরিত হচ্ছিল আমার দৃষ্টিপথে। বর্ণনাগুলো শুনতে শুনতে অরূপ বললো,' এত সুন্দর বললে...না গিয়েও সবটাই যেন ছবির মতো ভেসে উঠছে...কাল একবার যাওয়া যেতে পারে, কি বলো?'

' অবশ্যই। এসেছি যখন, দৌলতাবাদ ঘুরে যাবো না তা কি হয়...'

' সত্যি, হোটেলটা কিন্তু দারুণ জায়গায়!'

এ নিয়ে আমার মনেও কোনো সন্দেহের অবকাশ রইলো না...ভিউটা বড়ই চমৎকার আমাদের 'হোটেল রতন প্যালেসের।'

আমি,অরূপ আর সমীরণ...আমরা তিনজন হোটেলের প্রথম ঘরটা নিলাম। আমাদের পাশের ঘরে সুবীর, কমল আর নিরুপম।

বেশ পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন ঘরখানা। একটা অদ্ভুত আতর জাতীয় কিসের গন্ধ নাকে আসছিল অনেকক্ষন ধরে। বেশ উগ্র। সুবীর কি একটা কাজে এ ঘরে ঢোকামাত্রই অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলো

' তোমাদের ঘরেও দেখছি সেই হুবহু একই গন্ধ!'

' আতর বুঝলে না..? এখানে আতরের দারুণ চল। রাস্তায় বেশ কয়েকটা বাঈজী বাড়ি চোখে পড়েছে।' বললো সমীরণ।

' অথচ বাইরে গেলে দেখেছো, কোথাও কোনো গন্ধ নেই..!'

'বেশ্যা বাড়ির আতর মেখে কেউ বা কারা তাহলে এ ঘরে এসেছিল... আমরা আসার জাস্ট কিছু আগেই..। আবার এমনও হতে পারে, খানদানি পাবলিক... চোখে সুরমা, গায়ে আতর ছিটিয়ে...। যতই যা বলো জায়গাটার রক্তেই কেমন একটা...! স্টেশন ছাড়ালে মুসলিম পাড়া.... পুরোনো পুরোনো বাড়ি...দোতলার কোনো নাচমহলের খোলা জানলা দিয়ে ভেসে আসা গহরজান কিংবা আখতারি বাঈ ঘরানার ওস্তাদী গানের সুর...ভাসা ভাসা দু কলি গুণগুণ করতে করতে আরো এগিয়ে চলেছি...নীচু বসতি, গোস্ত রুটির সারি সারি দোকান, বারিফ, কিরপাস, গালিচা, কার্পেট, শেরওয়ানি ঝোলানো ঝলমলে বাজার, আর একদিকে বাঈজী নাচানো শেরিফ কালচারের ছোঁয়া.... সুলতানি যুগ থেকে মুঘল যুগে প্রবেশের কালে এরকম একটা রোমাঞ্চকর কিছু তো থাকবেই....! '

সমীরণের কথায় হেঁয়ালির সুর। খানিকটা রসিকতার সুরও।

হবে হয়তো। তবে এই মুহূর্তে পাওয়া অদ্ভুত গন্ধটার মধ্যে কোন্ ইতিহাসের আঘ্রাণ লুকিয়ে রয়েছে, এটা নিয়ে বেশি আর গবেষণা না করে খাওয়া দাওয়া সারতে বেরিয়ে পড়লাম সবাই। এখানে পৌঁছাতে পৌঁছাতে বেলা প্রায় গড়িয়ে গিয়েছে। সকলেরই পেটে ছুঁচোয় ডন দিচ্ছে তখন।

খাওয়া দাওয়া সেরে অন্য বন্ধুরা আগে আগে চলে গেল হোটেলে বিশ্রাম নিতে। আমি আর অরূপ কিছু টুকিটাকি জিনিস কিনে সবেমাত্র নিজেদের ঘরে এসে জামাকাপড় ছাড়ছি, হঠাৎই 'ঘটাং..ঘটাং..ঘটাং... '।

ঘরের বাঁদিকে একটা তালাবন্ধ টিনের দরজা। পেছন থেকে কে যেন ধাক্কা মারছে একটানা অনবরত..!

আমরা তিনজনেই সমস্বরে বলে উঠলাম

'ইধার নেহি, উধার সে আইয়ে...!'

তবু কোনো ভ্রূক্ষেপ নেই যেন কারো।

' শুনতে পাচ্ছে না নাকি? আরে ইধার নেহি..!'

সমীরণকে থামিয়ে দিয়ে আমি বললাম,

'দাঁড়াও ব্যাপারটা দেখতে হচ্ছে। '

দরজার মাথায় একটা ঘুলঘুলি। একটা টুলে উঠে ভেন্টিলেটারে মুখ বাড়িয়ে দেখতে গেছি, সাথে সাথে থেমে গেল আওয়াজটা। কিন্তু যেটা আমাকে হতবাক করে তুললো,সেটা হলো বাইরের চারিপাশ।

সামনে প্রকান্ড এক মাঠ। সেই মাঠের সিংহভাগ জুড়ে একের পর এক গোরস্থান। কোনোটা ভাঙা ইট,পাথরের কবর,কোনোটা আবার রঙিন কাপড়ে আচ্ছাদিত বাঁধানো সিমেন্টের কবর। সমাধিগুলো বেশিরভাগই অরক্ষিত। এসব কত বছর আগেকার কে জানে! সুলতানি, মুঘল যুগের সুদীর্ঘ ইতিহাসের গোপন স্বাক্ষ আজও কি মাটির তলায় লুকিয়ে নেই? অবশ্যই আছে। কে বলতে পারে, একদিন হয়তো এই গোটা জায়গাটা জুড়েই ছিল গোরস্থান। সেই হিন্দু রাজত্ব থেকে শুরু করে যুগে যুগে কত যুদ্ধ, রক্তপাত, হত্যালীলা আর মর্মান্তিকতার ঘটনাই না ঘটেছে এখানে! এই হোটেলের ভিতের নীচে চাপা পড়ে থাকা সেসব অতৃপ্ত আত্মা হয়তো আজও হাহাকার করে ওঠে একাকি নিঃসঙ্গ রাত্রে কিংবা.... মনের ভেতর অগোচরে কিরকম একটা অদ্ভুত অনুভূতি জেগে উঠলো যেন! জোড় করে নিজেকে বোঝাতে চাইলাম, কি ভাবছি এসব!

বিকেল পড়ে এসেছে। আকাশের কোলে সূর্য ডুব দেবার মুখে। অদ্ভুত নিস্তব্ধতা চারপাশে। একটা হালকা আতরের গন্ধ দূর থেকে নাকে আসছে। যেটা প্রথম টের পেয়েছি আমিই, এ ঘরে পা দেওয়া মাত্রই..। তাহলে কি এখান থেকেই..? কিন্তু তাই বা কী করে হবে? ঘুলঘুলি টুকু ছাড়া চারিদিক বন্ধ। অত দূর থেকে ঐ হালকা গন্ধ কীকরেই বা ঘরে এসে তীব্র ভাবে ছড়াবে? বুঝলাম না কিছুই। তবে সমীরণের তখনকার বলা কথাটা যেন বিদ্যুতের মতো ঝলকানি দিয়ে উঠলো মনের ঈশাণ কোণ থেকে..."যতই যা বলো জায়গাটার রক্তেই কেমন একটা....!"

ছাইলিপি

দরজার একেবারে গা ঘেঁষে অনেকটা জায়গা জুড়ে ঘন কাঁটাঝোঁপ, জংলা,বুনো ঝোপঝাড়... রাবিশের স্তূপ, ভাঙা কাঁচের টুকরো ছড়ানো... অনেকটা উঁচু হোটেলের সীমানার পাঁচিল...ওপারে ধূ ধূ মাঠ, যেখানে গোর দেওয়া হয়...পাঁচিলের পেছন প্রান্তে দেওয়ালের গা ঘেঁষে একটা ধূসর রঙের পাকুড় গাছ ঝুরি ডালপালা সমেত ছায়া মেলে দাঁড়িয়ে আছে...বোঝাই যায় অনেকদিন ধরে দেওয়াল ঘেঁষা এ জায়গাটা অব্যবহৃত, একটা গার্বেজের মতো হয়ে রয়েছে। এই জঙ্গল, আস্তাকুঁড় ডিঙিয়ে কোনো সুস্থ মানুষ কেনই বা এসে দরজায় ওরকমভাবে ধাক্কা দেবে? আর যদি বদমাইশি করেও কেউ এ কাজ করে থাকে, তাহলে সে গেল কোথায়? লুকিয়ে পড়ে নি তো? সীমানার পাঁচিল এতটাই উঁচু, চটজলদি সে পাঁচিল টপকে পালিয়ে যাওয়া মোটেই সহজ কাজ নয়।

যতদূর চোখ যায় ভালো করে দেখলাম, সামনে পেছনে,ধারে কাছে কেউ কোথাও নেই! ঝোপঝাড় যত ঘনই হোক, বুনো গাছপালাগুলো এতো বড়ও নয় যে কেউ ওর ভেতর লুকিয়ে বসে থাকলে দেখা যাবে না। একটা মানুষ কি করে এত তাড়াতাড়ি এসে সেকেন্ডের মধ্যে মিলিয়ে যেতে পারে, কিছুই মাথায় ঢুকলো না। তবে বেশ বুঝতে পারছি, একটা অস্বাভাবিক কিছু ঘটছে বা ঘটতে চলেছে..যা এখনো পর্যন্ত আমাদের ব্যাখ্যার বাইরে।

ব্যাপারটা শুনে তাজ্জব হয়ে গেল বাকীরাও।

পাশের ঘর থেকে হঠাৎ সুবীর আর নিরুপম দৌড়ে এল।

' কী হয়েছে? '

সুবীরের মুখ চোখে কেমন একটা ভয়ের ছাপ।অন্যমনস্কভাবে এদিক সেদিক তাকাতে তাকাতে বললো,' একটু আগে করিডরে দাঁড়িয়ে সিগারেট খাচ্ছিলাম। পেছন থেকে হঠাৎ কে যেন গায়ে এসে টোকা মারলো। তিন তিন বার। ঘুরে তাকিয়ে দেখি কেউ কোথাও নেই! শুনশান করিডর। সামনে ঘাড় ফেরাতে গেছি, আচমকা সাদা মতো কি যেন একটা আমাকে ক্রস করে নিমেষে মিলিয়ে গেল.. দু দুবারই সেম এক্সপেরিয়েন্স..! '

নিরুপমের মধ্যেও কেমন যেন উদ্ভ্রান্তের ছাপ।

'আমার এক্সপেরিয়েন্স কী হয়েছে শুনবে? ও ঘরে তখন কেউ ছিল না। একটু রেস্ট করছিলাম খাটে।

আচমকা একটা দুলুনিতে তন্দ্রা কেটে গেল যেন। দেখি খাটটাকে একবার এদিক একবার ওদিক কে যেন নাড়িয়েই চলেছে সমানে...তড়াক করে উঠে পড়লাম..অত ভারী খাট, কোনো মানুষের পক্ষে কখনো সরানো সম্ভব! ঘরে কেউ কোথাও নেই..! এসব কী হচ্ছে বলো দেখি?'

' ম্যানেজার..ম্যানেজারকে ধরতে হবে। চলো এখনি..।'

আমাদের হৈ চৈ শোনামাত্র ম্যানেজার আর কেয়ারটেকার দু'জনেই দেখি ততক্ষণে এসে হাজির। আতরের কাহিনি থেকে শুরু করে ইতিপূর্বে ঘটে যাওয়া সব ঘটনা তাকে খুলে বলা হলো এবং একই সঙ্গে কৈফিয়ৎ চাওয়া হলো। লোকটা অভয় দিল এই বলে,' এতবছরকার হোটেল ব্যাবসা। কেউ তো কখনো কমপ্লেন করে নি। তবু পরে আবার যদি কোনো অসুবিধে হয়, আমাদের সাথে সাথে ডেকে পাঠাবেন।'

এটা বেশ বুঝতে পারলাম লোকদুটো কিছু একটা চেপে যাচ্ছে আমাদের কাছে। আরো একটা দিন থাকতে পারতাম ঐ হোটেলে। কিন্তু সে রাতে যে ঘটনাটা ঘটলো, তার পরের দিনই সকাল বেলা 'রতন প্যালেস' ছাড়তে একপ্রকার বাধ্যই হলাম আমরা।

ঠিক হলো, রাতে সকলে মিলে একই ঘরে একসাথে শোবো। কেউ খাটে, কেউ জায়গা না পেয়ে মাটিতে শতরঞ্জি পেতে খেয়েদেয়ে শুয়ে পড়লাম।

সন্ধ্যার দিকে বেরিয়েছিলাম যাদব বংশীয় রাজা রামচন্দ্রদেবের আমলের প্রাচীন দেবগিরি শহরকে দেখতে। সেখান থেকে মহম্মদ বিন তুঘলকের হাতে নতুন করে তৈরি দৌলতাবাদ, পরবর্তিকালের আহম্মদ নগর, নিজামশাহী রাজধানী, দূর্গ প্রাসাদ, এ শহরে অতিবাহিত সম্রাট ঔরঙ্গজেবের জীবনের শেষ দিনগুলি, সম্রাটের হাতে গড়া প্রেমের আখ্যাণ..তাজমহলের ব্যার্থ অনুকরণ গায়ে মেখে দাঁড়িয়ে থাকা 'বিবি কা মকবারা'... শুয়ে শুয়ে বন্ধুরা মিলে এসব নিয়েই আলোচনা করছিলাম আর ভেসে বেড়াচ্ছিলাম যেন অন্য এক ইতিহাসের রাজ্যে। পথে পথে পাথর ছড়ানোর মতো ফ্যাকাশে ফ্রেমে ঝলমলে, রোমাঞ্চকর, খন্ড বিখন্ড হয়ে যাওয়া এক একটা অধ্যায়ের মাঝে।

রাত তখন কত গভীর জানি না। গল্প করতে করতে ক্লান্ত শরীর গুলো কখন যে ডুব দিয়েছে ঘুমের রাজ্যে..।

হঠাৎই একটা ক্ষীণ গলার আওয়াজ ঘুমটা যেন আচমকা ভাঙিয়ে দিল আমার।

' রা...আ..আ..জীব দা.. রাজীব দা.. আমাকে বাঁচান.. আ..আ...আ..আমাকে..!'

নিরুপম! ও আমার একেবারে পাশেই শুয়ে আছে। অন্ধকার ঘর। কিছু দেখছে পাচ্ছি না। শুধু গলাটা শুনতে পাচ্ছি। খুব কষ্ট পেলে মানুষ যেভাবে ককিয়ে ওঠে ঠিক যেন..!

'রা..আ...আ..জীবদা...আ..আ..মাকে..!'

তড়াক করে লাফ দিয়ে উঠে আলো জ্বালালাম। সকলে ততক্ষণে জেগে উঠেছে। তাকিয়ে দেখি, ভয়ার্ত, বিস্ফারিত চোখে সিলিংয়ের দিকে চেয়ে আছে নিরুপম। দুটো হাত দিয়ে চেপে রয়েছে নিজের গলাটা। কাঁপছে ঠকঠক করে। বুকের তলদেশ থেকে বেরিয়ে আসছে ঘনঘন নিঃশ্বাস।

"পরের দিনের কথা। ভোরবেলায় যে যার মালপত্র গুছিয়ে আমরা বেরিয়ে পড়লাম হোটেল ছেড়ে। এখানে টাঙা পাওয়া খুব সহজলভ্য। পেয়েও গেলাম। এক একটা গাড়িতে দুজন করে উঠে বসলাম। আমার পাশে ছিল কমল। কেন জানি না বেশ কিছুক্ষণ ধরে কি একটা বলবার জন্য উসখুস করছিল ও। আমি ওর দিকে তাকাতে কমল মুখ খুললো। "

সেই পরিস্থিতিতে নিরুপমকে আপাত স্বাভাবিক করতে একটা রাত লেগে গিয়েছিল আমাদের। ওর কথা অনুসারে, ' সবাই যখন ঘুমে প্রায় অচৈতন্য, আমি জেগে তখনো। কি জানি,ঘুম আসছিল না কিছুতেই। হঠাৎ দেখি পাশ থেকে কার একটা শক্ত কঠিন হাত ক্রমশ আমার গলার নলিটাকে চেপে ধরছে। আঙুলের নিষ্পেষণে দম বন্ধ হয়ে আসছে আমার। আমি প্রাণপণে চেষ্টা করছি ছাড়াতে। কি বজ্রকঠিন সে দুটো হাত। কি নৃশংস! আরো একটা শব্দ কানে আসছিল পাশ থেকে। একটা অদ্ভুত, প্রতিহিংসা পরায়ণ হিস হিস শব্দ.. ছেলে না মেয়েলি কন্ঠ, সে বোঝার সাধ্য তখন আর আমার নেই... আমার জীব বেরিয়ে আসছে... আমার...আমার..!'

বলতে বলতে কিরকম যেন চুপ মেরে যায় নিরুপম। চোখগুলো ভয়ার্ত হয়ে ওঠে আবার।

পরের দিনের কথা। ভোরবেলায় যে যার মালপত্র গুছিয়ে আমরা বেরিয়ে পড়লাম হোটেল ছেড়ে। এখানে টাঙা পাওয়া খুব সহজলভ্য। পেয়েও গেলাম। এক একটা গাড়িতে দুজন করে উঠে বসলাম। আমার পাশে ছিল কমল। কেন জানি না বেশ কিছুক্ষণ ধরে কি একটা বলবার জন্য উসখুস করছিল ও। আমি ওর দিকে তাকাতে কমল মুখ খুললো।

' একটা খবর জানতে পেরেছি... সেটাই তো বলবো বলবো করছি...!'

' কী খবর?'

' হোটেলের সামনে রাস্তার ধারে একটা পানের দোকান ছিল মনে আছে?'

' হ্যাঁ ছিল বটে একটা।'

' ওখানে পান কিনতে গিয়ে কথায় কথায় দোকানের ছেলেটাকে জিজ্ঞেস করি হোটেলটার বিষয়ে। গত রাতে ঠিক কি কি ঘটেছিল তা ও বললাম। শুনে কি বললো জানো? '

কৌতূহলের সুরে জিজ্ঞেস করলাম,' কী বললো?'

কচকচ করে পান চিবোতে চিবোতে কমল বলতে লাগলো...'হোটেলটা নাকি ভালো নয়। পশ্চিমের ঐ একতলার ঘরটা, যেটাতে আমরা রাতে শুয়েছিলাম, ঐ ঘরেই বছর কয়েক আগে একটা মার্ডার হয়ে গেছে। ভাবো একবার! হোটেলওয়ালা সব জানে...কাস্টমার হারাতে হয়, এই ভয়ে কিছু বলে না! নিরুপমটাকে দেখে খুব খারাপ লাগছে...কিরকম যেন ট্রমাটাইজ হয়ে গিয়েছে...'

এই ঘটনার প্রায় বছর পাঁচেক পর আমার বোনের মুখে একদিন শুনি, কোলাঘাটে ওর শ্বশুরবাড়ির পাশের এক ভদ্রলোক ফ্যামিলি নিয়ে কিছুদিন আগে ঔরঙ্গাবাদ বেড়াতে গিয়ে হোটেলের ঘরে এক অস্বাভাবিক অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হয়।

' রীতা বৌদি, মানে ভদ্রলোকের স্ত্রী যখন ঘটনাটা বলছিলেন, তখন আমার বারবার তোদের সেই স্কুল থেকে বেড়ানোর কথাটা মনে পড়ছিল।'।

বললো মিলি, মানে আমার বোন।

কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, ' আচ্ছা ওনাদের হোটেলটা কি স্টেশনের খুব কাছে ছিল? পাশে একটা বিশাল মাঠ। একের পর এক গোরস্থান। ওদিকে মসজিদ। বাঈজী মহল্লা। তারই মাঝে "হোটেল রতন প্যালেস"...মানে, যেখানে আমরা ছিলাম...।'

আমার বোন অবাক চোখে তাকিয়ে বললো,' আরে এ তো সেই একই হোটেল! হবহু একই অভিজ্ঞতা! ওরাও থাকতে পারে নি এক রাতের বেশি...লোকমুখে পরে জানতে পেরেছে, হোটেলটা ভালো না।...'

বহুবছর কেটে গেছে তার পরেও।

'হোটেল রতন প্যালেস' এর সে রহস্য আজও আমাকে ভাবায়, হন্ট করে। পরিচিত কিংবা আত্নীয় মহলে যারা এ কাহিনি পরে আমার মুখে শুনেছেন, কেউ হয়তো বিশ্বাস করেছেন, কেউ করেন নি, কেউ মন থেকে বিশ্বাস না করলেও আকর্ষণীয় গল্পের মতো চুপ করে শুনে গেছেন। লোকমুখে শোনা হলে এতদিনে হয়তো ধূলোর মতো উড়িয়েই দিতাম, অন্য অনেকের পথে হেঁটে। ভূত,প্রেত মানি না। তাই বলে বাস্তব অভিজ্ঞতা.. তাকে তো অস্বীকারও করতে পারি না কোনো মতেই। সেই ঘটনার পর বহু বছর একা ঘরে, আলো নিভিয়ে ঘুমোতে পারতো না নিরুপম। আর আমার চোখে ভাসতো ওর ঐ ভয়ার্ত মুখখানা। সিলিং এর দিকে তাকানো। বিস্ফারিত দুটো চোখ।। সমাপ্ত।

ও পলাশ ও শিমুল কেনো এ মন মোর রাঙালে

ড. সুবীর মণ্ডল

রূপসী বাংলার ঋতু নাট্যের রূপশিল্পী বসন্ত আজ জাগ্রত দ্বারে।অশোক-পলাশ-শাল- মহুয়া-শিমুলের রঙিন বিহ্বলতায় কোকিলের কুহতানে নীলদিগন্তে যখন বিহ্বল উল্লাসের পরশ ঠিক তখনই দোলের আগের রবিবারের ছুটি" র হাত ধরে এই পাগলকরা মনটা যেন পাড়ি দিতে চাইল সবুজ উপত্যকা আর পলাশের আকরভূমি পুরুলিয়ার অপরূপা অনিন্দ্যসুন্দর স্বপ্নের ফুটিয়ারি ড্যামে । বসন্তে জঙ্গলমহল পুরুলিয়ার উজাড় রূপমাধুর্য এককথায় তুলনাহীন । এ-এক অন্যভুবন। লোকচক্ষুর আড়ালে থাকা এক মনোমুগ্ধকর জঙ্গল- নদী আর পাহাড়ের অপূর্ব মেলবন্ধন কাশীপুরের রাজবাড়ির কাছে অবস্থিত ফুটিয়ারি ড্যাম।

নাগরিক জীবনের হাজারো ব্যস্ততা আর সময়ের টানাটানিতে অবসর মেলে না সহজে। তাই মন কেমন করা দোলের আগের দিনে এক কাকভোরে ' দ্যত্তেরি'বলে, কেজো জীবনকে গুডবাই জানিয়ে কাঁধের ঝোলাটি তুলে নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম পলাশের দেশে। করোনা কাল শেষ হতেই প্রকৃতির ডাককে অস্বীকার করতে পারলাম না।শেষে দ্বিধা-দ্বন্দ্ব কাটিয়ে তিন পাহাড়ে ঘেরা মনোমুগ্ধকর ফুটিয়ারির রূপ-রস-বর্ণের অমোঘ হাতছানির ডাকে সাড়াদিতে বাধ্য হলাম। নতুন বছরে বসন্তের শুরুটা বেশ মনোরম । করোনাকালের ভয়াল স্মৃতি আজ অতীত। জঙ্গলমহলের প্রকৃতি নবসাজে সজ্জিত। কোলাহলমুখর খাতড়া শহর থেকে সামান্য দূরে আসতেই পথের দুপাশে পেলাম লাল পলাশের অযাচিত উষ্ণ অভ্যর্থনা। এ-যেন পলাশের মন মাতাল করা বন্যরূপ । পূবদিকে সূর্যদেব কাঁচাসোনা রঙ ছড়িয়ে উঁকি দিতে শুরু করেছে। এক মায়ামাখানো পরিবেশ। শুধু মুগ্ধতার পরশ। জঙ্গলমহলের মসৃণ রাস্তা দিয়ে লাল মাটির হৃদয় ছুঁয়ে হাতিরামপুর হয়ে মানবাজার শহরের দিকে গাড়ি চলেছে খুব গতিতে। চটপট প্রকৃতি পাল্টাচ্ছে ।শেষমেশ হাতিরামপুর, মানবাজার, হুড়া,পুঞ্চা হয়ে দু'ঘন্টায় পৌঁছলাম কাশীপুর শহর ছাড়িয়ে ১৮ কিমি দূরে ফুটিয়ারিতে। একটু চা -পানের ক্ষণিক বিরতি। বসন্তের ঝকঝকে মেঘমুক্ত সকাল, ইতিউতি ফুটে আছে পলাশ। মন ভরে উঠল। গাড়িতেই টিফিনপর্ব সারলাম। ঢেউ খেলানো মসৃণ স্বপ্নের রাস্তা। ইতিউতি তিনখানা তিলাবনি-- পাঞ্জানিয়া আর সিন্দুরপুর পাহাড়ের হাতছানি আর চোখ জুড়ানো সবুজ প্রকৃতি। ভালোলাগা অনেকটাই বাড়িয়ে দিল দূষণমুক্ত নির্মল অনাঘ্রাতা প্রকৃতির মায়াবী রূপ। । পুরুলিয়ার নতুন পর্যটনস্থল ফুটিয়ারি ড্যাম। খুব বেশিদিন প্রচারের আলোয় আলোকিত হয়নি। তবে পাশের জায়গা দেখে চোখ জুড়িয়ে গেল । শুধু সুবিস্তৃত জলরাশি নয়, এখানকার বিস্তীর্ণ এলাকাজুড়ে ছড়িয়ে থাকা পাহাড় আর সোনাঝুরি-শালের জঙ্গলে যেন এক অদ্ভুত মাদকতা রয়েছে। তাই একান্তে কোনও সকাল, বিকেল বা গোধূলি দারুণ কাটতে পারে। । বর্ষা, শীত আর বসন্তে পর্যটকদের ভিড় বাড়ে । রাতের জ্যোস্নায় নৌবিহার রোমাঞ্চকর। নৈসর্গিক সৌন্দর্য আর এক অদ্ভুত নির্জনতা নজর কাড়বেই।

সুন্দরী কলাবনী আর লধুড়কার মাঝে ফুটিয়ারি'র রূপকথার অন্যভুবন । আপন খেয়ালে বয়ে চলা ফুটিয়ারি নদীর ছন্দের তাল কাটে ফুটিয়ারির ড্যামে, তিন দিক থেকে চলে শাসন তিন পাহাড়ের, তিলাবনি-পাঞ্জোনিয়া- সিন্দুরপুর এই ত্রয়ীর কড়া অনুশাসনে ফুটিয়ারি গেঁথে চলেছে রূপকথা কাহিনী।
নীল জলের ওপারে ঘাড় উঁচু করে থাকা তিলাবনি পাহাড়ের ঠিক নীচেই রয়েছে ফুটিয়ারির অনিন্দ্যসুন্দর ড্যাম। এক কাব্যিক নাম কলাবনি। আসলে কলাবনি হল আদিবাসীদের একটা স্বপ্নের গ্রামের নাম। ড্যামের পাশে একটি হাই স্কুল দেখলাম। লজ মালিক মেঘনাদ মণ্ডলের কাছে শুনলাম ২০০০ সালে ফুটিয়ারি নদীর উপর তৈরি হয়েছে এই ড্যাম। দৈর্ঘ্য আঁড়াই কিলোমিটার, প্রস্থ দেড় কিলোমিটার, গভীরতা ৮০-৯০ ফুট। পুরুলিয়ার অনেক বাঁধই ওভারফ্লো ড্যাম, সেচ বিভাগের তথ্যসূত্র অনুযায়ী। । এই ড্যামটি তেমনই। নীল জলে থরে থরে ফুটে রয়েছে লাল, গোলাপি শালুক। শালুকপাতার উপর পা ফেলে নাচ দেখাচ্ছে পরিযায়ী পাখি। পরিযায়ী পাখিদের স্বর্গরাজ্য ফুটিয়ারির ড্যাম। অপূর্ব সেই ভঙ্গিমা! পানকৌড়ি সাঁতার দিতে দিতে হঠাৎমুখ তুলছে।

নানান প্রজাতির নানান রঙের পাখি চোখে পড়ছে জলাশয় ও তার আশপাশে | করচে বুক, শামুকখোল, নীলকণ্ঠ, জলমোরগ, হলদে টিট্টি, হুপো, ঘুঘু, মুনিয়া, আরও কত! নিখাদ পক্ষীপ্রেমীদের কাছেও এক দারুণ আকর্ষণীয় জায়গা ফুটিয়ারি। রংবেরঙের পাখিদের জলকেলি । মুগ্ধ হয়ে দেখছি এইসব মনমাতানো দৃশ্য, হঠাৎই মাথার উপর দিয়ে উড়ে গেল এক ঝাক শামুকখোল ।

শীতের পাতা ঝরার রিক্ততা,বসন্তে পলাশ, শিমুল, কুসুমের রক্তিমাভায় রঙিন প্রকৃতি -- দুর্দান্ত সিল্যুয়েট নিয়ে তুলনাহীন পুরুলিয়ার এক টুকরো রূপকথার জগৎ ফুটিয়ারির ড্যাম। দুপুরে খাওয়ার পর্ব শেষ করলাম ফুটিয়ারির সুন্দর রিসর্ট অহল্যাভূমিতে, মালিক তিলাবনির মেঘনাদ মণ্ডল। চব্বিশ বিঘা জমির উপর বিশাল সাজানো গোছানো রিসর্ট। খাওয়ার পর আবার পথ চলা।আশেপাশের গ্রামের মধ্যে প্রবেশ করলাম। পলাশের বাড়াবাড়ি উপস্থিতি ,মন ভরে গেল। ফিরে এলাম ড্যামের কাছে। ধীরে ধীরে সূর্যদেব ক্রমশ পশ্চিম আকাশে ঢলে পড়ছে। এক মায়াবী মনোমুগ্ধকর দৃশ্য। কিছুক্ষন পরেই এক অপরূপ প্রাকৃতিক দৃশ্যের সামনে। রক্তিম অস্তরাগ ছড়িয়ে পড়ল আকাশে ও জলে। টিয়াপাখিদের মতোই নীড়ে ফেরার সময় হল আমাদের | লজের ব্যলকনিতে বসে সূর্যাস্তের রঙের খেলা দেখছি,সময়েরহাতধরেই সন্ধ্যার আগমন। রাত বাড়ছে ।

শীতের পাতা ঝরার রিক্ততা,বসন্তে পলাশ, শিমুল, কুসুমের রক্তিমাভায় রঙিন প্রকৃতি -- দুর্দান্ত সিল্যুয়েট নিয়ে তুলনাহীন পুরুলিয়ার এক টুকরো রূপকথার জগৎ ফুটিয়ারির ড্যাম। দুপুরে খাওয়ার পর্ব শেষ করলাম ফুটিয়ারির সুন্দর রিসর্ট অহল্যাভূমিতে, মালিক তিলাবনির মেঘনাদ মণ্ডল।

আকাশের চাঁদটার আজ ভরা যৌবনবতী। সরোবরের জলে তারই পূর্ণ প্রতিবিম্ব। মায়াবী জ্যোৎস্না আলগা আদরে লেপ্টে আছে চারপাশ। নিঃশব্দ, নিস্তব্ধ আবহে আমি। এমন মায়াবী রাত সচরাচর জীবনে আসে না। এ- এক পরম প্রাপ্তি। রাতের জ্যোৎস্নার আলোয় আলোকিত স্বপ্নের ফুটিয়ারি। ।জনপদ ছাড়িয়ে সবুজ গাছের আর পাহাড়ের আড়ালে নিজের সৌন্দর্যকে লুকিয়ে রেখেছে ফুটিয়ারির ড্যাম । প্রকৃতির নিভৃত আঁচলের তলায় মুখ লুকানো তিন পাহাড়ের ঘেরা ড্যাম দেখে আমরা মুগ্ধ হতে লাগলাম।

আমরা এগোতে লাগলাম সোনাঝুরির বনের মাঝ বরাবর পিচ রাস্তা ধরে। বলা বাহুল্য কোন মানুষের চিহ্ন নেই। জল- জঙ্গলের মাঝে বিভোর হয়ে সেই জ্যোৎস্না রাতে কতক্ষণ আমরা হেঁটেছিলাম খেয়াল নেই। ঘোর ভাঙল রিসর্টের ম্যানেজারের মোবাইলের শব্দে। রাতের খাবার হয়ে গিয়েছে, তারই খবর এল। রাতের খাবার পর্ব সারলাম। আবার চলে এলাম ফুটিয়ারির ড্যামের কাছে। ফুটিয়ারির ড্যামের দীর্ঘবাঁধ ধরে ধরে হাটতে শুরু করলাম।

বেশ কয়েক কিলোমিটার এলাকা জুড়ে শাল, তাল, পলাশ আর সোনাঝুরি সহ বেশ কিছু গাছের একটা ঘন সবুজ পরিবেশ। তারই ঠিক মধ্যিখানে ফুটিয়ারির ড্যামের অবস্থান। সুন্দরী নারীর মুখে ছোট্ট তিল যেমন তাকে রূপসী করে তোলে, তেমনই জলের মধ্যে জেগে থাকা বেশ কিছু সোনাঝুরি, তাল গাছ এই ড্যামের সৌন্দর্য বাড়িয়ে দিয়েছে অনেকটাই।

থাকার জন্য সম্প্রতি বেশ কয়েকটি গেস্ট হাউজ বানিয়েছে বিভিন্ন সংস্থা । একেবারে ড্যামের ধারেই তাদের অবস্থান। একটি আধুনিক সাততলা বিশিষ্ট বিশাল গেস্টহাউসের কাজ শেষ পর্যায়ে। নৌবিহারের ব্যবস্থাও রয়েছে। তবে পুরুলিয়ার অন্য জায়গার মত এই জায়গাটির একটি নিজস্বতা আছে। সত্যিই ফুটফুটে ফুটিয়ারির সৌন্দর্য অনিন্দ্যসুন্দর। ইচ্ছা হল ড্যামের বুকে রাতে নৌকায় ভ্রমণ। একটু ভয় হলেও এক নৌকার মাঝিকে রাজি করালাম। শুরু করলাম ফুটিয়ারির বুকে চাঁদের আলোয় নৌ অভিযান। শরৎচন্দ্রের শ্রীকান্ত ও ইন্দ্র নাথের নৈশ অভিযানের কথা মনে পড়ে গেল।
চাঁদনি রাত রূপোলি নরম আলো স্পর্শ করেছে ফুটিয়ারির ড্যামের নদীর শরীর।তিরতির করে কাঁপছে নদীর জল।দুলেদুলে উঠছে আমাদের নৌকা।গন্তব্য তিলাবনি পাহাড়ের দিকে ,সোনাঝুরি, তাল,পলাশের সবুজ অরণ্য। রোমান্টিক স্বপ্ন জালে বোনা সুন্দরবনের ভয়াল,ভয়ঙ্কর ম্যানগ্রোভ অরণ্যেরকথা মনে পড়ল।বুক ছমছমে গভীর রাত। ভয়াল-রহস্যঘেরা তিনখানা পাহাড় আর শাল,পলাশ, সোনাঝুরি অরণ্যের সামনে ছলাৎ ছলাৎ জলে টইটম্বুর ফুটিয়ারির নদী।পূর্ণিমা রাত- -মায়াবী আস্তরণ।সম্পূর্ণ আঁধার হলে দিগন্ত হয়ত চোখে পড়ত না সে ভাবে।কিন্তু নিকষ কালো নয় ,চারদিকের মায়াবী জ্যোৎস্নায় আকাশ -লেক-অরণ্য নীলের নানা ছায়ে যেন প্রকাণ্ড এক স্বপ্নময় ক্যানভাস।জীবন শিল্পীর তুলিতে আঁকা অপরূপ নিসর্গ। ড্যামের অন্য প্রান্তে চোখ মেলে দেখছি সবুজ বনানীর মনোমুগ্ধকর দৃশ্য। মন ভরে গেল। গভীর রাতে এই পাগলামি বহুদিন মনের মণিকোঠায় অমলিন হয়ে থাকবে। রাত গভীর হতে লাগল, এবার ফেরার পালা। ফিরে এসে সবাই ঘুমের রাজ্যে পাড়ি দিলাম।

ছাইলিপি

পরের দিন খুব সকালে ঘুমকাতর চোখে হাজির হলাম ফুটিয়ারির ড্যামের তীরে। সকালের রূপ একবারেই অতুলনীয়।সূর্যোদয়ের দৃশ্যও অনিন্দ্যসুন্দর। ফুটিয়ারির ড্যাম আর সবুজ উপত্যকায় আমরা মজে গেলাম। সকালে ভীড় খুব বেশি ছিল না। স্হানীয় মানুষজন,জিপ,গাড়ির ড্রাইভার,আরকিছু পথভোলা পথিকের ঘোরাঘুরি। অপূর্ব নিরিবিলি শান্ত শান্তির পর্যটন স্হল এই তাল,পলাশের সবুজ বনানী আর লেক।ফুলে,বৃক্ষে, মানুষের হৃদয় ওপড়ানো অমলিন হাসিতে যা পেলাম তার সবটাই আমাদের বেঁচে থাকার রসদ। প্রকৃতির মহার্ঘ্যদান। দু'হাত দিয়ে নেওয়া। সাধারণ মানুষের আর্থিক অবস্থা খুব একটা ভালো নয়।ড্যামের জলে বেশ কিছু জায়গায় চাষাবাদ করে মানুষ বেঁচে আছে।সীমাহীন দারিদ্র্য বিমোচন-এর কোন সরকারি উদ্যোগ চোখে পড়লো না।এই পর্যটন কেন্দ্র হয়তো ওদের মুখে হাসি ফোটাতে পারে। সারাদিনের ব্যস্ততায় কখন যেন হাই তোলা সূর্যের সঙ্গে মেঘও তার চুল এলিয়ে দেয় ফুটিয়ারির ড্যামের বুকে । সোনালী আভায় লাজুক মুখ নিয়ে তিলাবনি--পাঞ্জানিয়া- সিন্দুরপুর পাহাড়ের ওপর অভিমান করে ঘুমিয়ে পড়ে অপরূপা সুন্দরী লেক। প্রকৃতির কোলে বেশ কিছুক্ষণ কাটিয়ে কাছেপিঠের বেশ কয়েকটি সুন্দর আদিবাসীদের জনপদ ঘুরে আমরা রওনা দিলাম কাশীপুর রাজবাড়ির দিকে।যাত্রাপথে এক স্বপ্নের নান্দনিক গ্রাম জোরখোল।দুগ্ধ উৎপাদনে নজর কেড়েছে। সেই সঙ্গেই মিষ্টি উৎপাদনে বেশ জনপ্রিয়তা । এবার ফেরার পালা। ফেরার পথেই কাশীপুর রাজবাড়ি।করোনার আবহে প্রবেশ নিষিদ্ধ। রাজবাড়ির অন্দরমহল দেখার সৌভাগ্য হলনা।স্বপ্ন অধরাই রইল। কাশিপুর শহর থেকে ৭ কিমি দূরে পুরুলিয়ার এক টুকরো সুন্দরবন, রঞ্জনডিহি যোগমায়া সরোবর। এখানে বেশকিছু সময় কাটালাম। হুড়া--পুঞ্চার থানার বিভিন্ন জনপদভূমি অতিক্রম করে এগিয়ে চলেছি।সেই সঙ্গে প্রকৃতি দ্রুত বদলে যেতে লাগলো। লালপুর হয়ে মানবাজার শহরের দিকে চলেছে আমাদের গাড়ি। অবশেষে পড়ন্ত বিকেলে কংসাবতী নদীর তীরে জিতুজুড়িতে পৌঁছলাম।নতুন পর্যটনস্থল। সামান্য কাটালাম। এবার ফেরার পালা,গন্তব্য খাতড়া মহকুমা শহর।

দুই দিনের প্রাপ্তির স্মৃতি রোমন্থন করতে করতে বিভিন্ন জনপদভূমি ছুঁয়ে ছুঁয়ে আমরা ফিরছি। গোটা অঞ্চল জুড়ে পলাশ আর কুসুম ফুলের বাড়াবাড়ি রকমের উপস্থিতি। মন পাগল করে দিল। সময়ের হাত ধরে সূর্য ডোবার পালা এসে গেল। বাসন্তীর পড়ন্ত বিকেলে পলাশের জঙ্গলের সঙ্গে আকাশের এই রঙের খেলার সাক্ষী আমরা পঞ্চপাণ্ডব।সবাই একসঙ্গে গেয়ে উঠলাম 'ও শিমুল,ও পলাশ দাও রাঙিয়ে দাও'। মন ভারাক্রান্ত। আবার সেই কেজো জীবনে প্রত্যাবর্তন। ঘড়িতে রাত দশটা বেজে গেছে। মন জুড়ে একটা মুগ্ধতা ও বিষন্নতা।রাত বাড়ে ,পাহাড়, জঙ্গল আর নদীর গান শেষ হয় না। পায়রাচালী ব্রিজের ওপরে পূর্ণিমার চাঁদ চুপিসারে উঠেছে, সবুজ অন্ধকারে। আকাশ ভরা তারায় তারায় শেষ হল বসন্তে পলাশের দেশের জঙ্গল জীবনের বর্ণময় এক ভ্রমণের জীবন।

কিভাবে যাবেন---
কোলকাতা থেকে মোট দূরত্ব প্রায় ২৮০ কিমি,সময় লাগবে প্রায় সাড়ে পাঁচ ঘন্টা। হাওড়া থেকে ট্রেনে। নামতে হবে পুরুলিয়ার আদ্রা।আদ্রা থেকে দূরত্ব মাত্র ২৫কিমি। বাঁকুড়া থেকে দূরত্ব মাত্র ৮০কিমি। রাজ্য সড়ক-- কোলকাতা- দুর্গাপুর-- বাঁকুড়া--- মানবাজার - পুঞ্চা -হুড়া কাশীপুর -- ফুটিয়ারি ড্যাম

বাঁকুড়া, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত।

বসন্ত ও যুদ্ধের রঙ

নিশিকান্ত রায়

ওখানে এক অন্ধকারের নদী
হাত ছুড়ে দেয় পা ছুড়ে দেয়
মেঘ ছুয়ে যায় ডানায় ডানায় আলোর পাশেই বসি।

এখানে আজ আকাশ মাটির পটে
চিলের ডানায় চাঁদের ফাঁদে চুমুর লুকোচুরি
ঘুড়ি এখন উড়তে উড়তে দূরের পাখির ঠোঁটে
খুদ কুঁড়োতে বুঁদ হয়ে যায়
একটা দুইটা তিনটা করে আধখানা রাত
ভাগ করে নেয়
নিম্নবিত্ত মধ্যবিত্ত উচ্চবিত্ত
পেশায় নেশায় বুঁদ হয়ে যায়।

আমার এখন ইচ্ছে ঘুড়ির আকাশটুকুই আছে
শব্দগুলো ঝুলছে শুকনো ডালে
তার ছন্দ গন্ধ রঙ শুয়ে থাকে ওই নুলো রোদের কাছে
গ্রীস্ম বর্ষা শীতে
টিকেট বিহীন ভ্রমন করা পরমায়ুর টানে।

ঘর বেঁধেও পায় না ফিরে ঘর
ঘরের মানুষ বহন করে যুদ্ধ শান্তি ক্লান্তি অবিরল
আমার ঘরেই লুকিয়ে থাকে আগন্তুকের দল।

আমি এখন যুদ্ধ শান্তি
আমি এখন ফাইল বন্দী শব্দমালার বাসর শয্যা
কাগজ কলম চুলচেরা এক মিটিং মিছিল
টেবিল গেলাস্
আটা ময়দা ফুলকো লুচি
মানুষ মেরে মানুষ নিয়ে প্রেমোন্মত্ত পাথর বাটি
টনে টনে বোমাবাজি
ধ্বংস মৃত্যুর ভন্ডখেলায় যুগলবন্দী ছবির শুটিং।

আমার গোলা বারুদ লুটিয়ে পড়ে ফাগুন বনে
যুদ্ধ যুদ্ধ ফাগুন ফুলে ঘুমিয়ে পড়ে
ভয়াল শব্দে ছোট্ট শিশুর বুকের পাঁজর তুষ হয়ে যায়
তুমুল বসন্ত খসে ডোবা নালা জুড়ে
যুদ্ধ শান্তির ভেলায় মত্ত পৃথিবীটা ঘুরে।

থানাপাড়া, লালমনিরহাট

সংখ্যাটি কিনে পড়ুন

সাপ্তাহিক স্রোত সংখ্যাটি পুনরায় ই-সংখ্যা আকারে প্রকাশ হওয়ার অন্যতম, অনুপ্রেরণা ছাইলিপির লেখক/পাঠক /শুভাকাঙ্খীরা । আমরা তাদের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই। ছাইলিপি একটি আদর্শমানের সাহিত্য পত্রিকা হয়ে উঠতে চায় আপনাদের হাত ধরে। আমাদের এই প্রচেষ্টাকে স্বাগত জানাতে পারে। আপনার সাধ্য অনুযায়ী মূল্য প্রদান করে কিনতে পারেন এই সংখ্যাটি।

বিকাশ- 01703689295
নগদ- 01703689295

আমাদের ডোনেশন করতে হোয়াটস অ্যাপে যোগাযোগ করুন উপরক্ত নম্বরে

দৃষ্টি আকর্ষণ

"সাপ্তাহিক স্রোত" ছাইলিপি সাহিত্য সাময়িকী কতৃক একটি সাপ্তাহিক সংখ্যা। যা বেশ কিছুদিন ধরে প্রকাশ হচ্ছিলো ।কিন্তু মাঝখানে অনাকাঙ্খিত কারনবশত সংখ্যাটির প্রকাশ কার্যক্রম বন্ধ হয়ে যায়। তবে দীর্ঘ সময় পরে সংখ্যাটি পুনরায় প্রকাশ হচ্ছে ই-পেপারের আদলে। প্রতি সপ্তাহের শুক্রবার সংখ্যাটি প্রকাশ হবে। সাপ্তাহিক স্রোত এর প্রথম ই-সংখ্যা হওয়ায় মোট ১৩ টি পাতায় প্রকাশ হচ্ছে সংখ্যাটি। এর পরের সংখ্যাগুলোতে পাতার সংখ্যা কমতেও পারে কিংবা বাড়তেও পাড়ে। লেখক এবং পাঠকরা এগিয়ে আসলে সংখ্যাটি চলমান থাকবে বলে আমরা আশাকরি।

লেখা আহ্বান

স্বাধীনতা দিবস সংখ্যা-২০২২

২৬ শে মার্চ মহান স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষ্যে ছাইলিপিতে পাঠাতে পারেন স্বাধীনতা দিবসের কবিতা, গল্প, প্রবন্ধ ও মুক্তগদ্য।

লেখা পাঠানোর শেষ সময়

২৫ শে মার্চ ২০২২

লেখা পাঠাতে ইমেইল করুন -

chailipimagazine@gmail.com

মান্যতার সংসার

গৌতম সরকার

ছোটগল্প

কলকাতা শহরে এত ভালো সূর্যাস্ত হয় নিউটাউনের এই হাউসিং কমপ্লেক্সে না এলে জানতে পারতো না প্রিয়ংব্রত। আরও বেশি করে ধন্যবাদ দিতে হয় মান্যতাকে, ওই তো বিকেল পড়তে না পড়তেই দুকাপ চা বানিয়ে চোদ্দতলার ওপরের ওই ছোট্ট ব্যালকনিতে বসে হাঁকের পর হাঁক পেরে যেত। প্রিয়ংব্রত বিরক্তই হত, কর্মজীবনে দম দেওয়া পুতুলের মত হিল্লি দিল্লি ঘুরতে হয়েছে, বিশ্রাম কাকে বলে জানতো না, তাই অবসরের পর সব না পাওয়া সুদে-আসলে তুলে নিতে চায়, দিবানিদ্রা তার মধ্যে অন্যতম। তবে বিরক্ত হলেও ঘুমভাঙা তেতো মেজাজ নিয়ে মান্যতার পাশে গিয়ে বসতে হয়েছে, চায়ের কাপেও চুমুক দিতে হয়েছে। মান্যতা যখন ফাঁকা কাপ হাতে ধরে অবাক চোখে পশ্চিম আকাশটা গিলে খেত, সেদিকে একঝলক তাকিয়ে প্রিয়ংব্রত বরাবর বলে এসেছে, "ধুর! কলকাতায় বসে সূর্যাস্ত! সূর্যাস্ত অতুঙ্গ পাহাড় চূড়া, অসীম-অপার নীল সমুদ্র, নিদেনপক্ষে ডুয়ার্সের জঙ্গল ছাড়া মানায় নাকি!" এরপরেই শুরু হতো, "তোমার মনে আছে মানু, বিনসরে আমাদের প্রথমবার সেই পিডব্লিউডি-র বাংলো থেকে দেখা অসাধারণ সূর্যাস্ত! আর খিরসু-র হাসপাতাল চত্বর থেকে দেখা অদ্ভুত সেই রঙের খেলা!" কথাগুলো মান্যতার কানে প্রবেশ করত, তবে সে কোনও উত্তর করতো না। নির্বাক হয়ে তার স্বপ্নদৃষ্টি জালে সূর্যাস্তের সব রংগুলো যেন শুষে নিত। ওর মুখে মেটে সিঁদুর রঙের একটা আলো এসে পড়ত। প্রিয়ংব্রত দুয়েকবার চমকে উঠেছে, সেইসময় মান্যতাকে কেমন অচেনা মনে হত। দেখতে দেখতে বসতে বসতে একটা অভ্যেস হয়ে গিয়েছিল, শেষের দিকে প্রিয়ংব্রতর চোখেও একটা ঘোর আসতো, শেষ বলতে মান্যতার শেষদিন গুলিতে। কাউকে কিছু বুঝতে না দিয়ে, শুশ্রূষার কোনও সুযোগ না দিয়ে একটা সাধারণ মাথার যন্ত্রনা আর বমি বমি ভাব নিয়ে রাত্রে কিছু না খেয়ে শুয়ে সকালে আর উঠলো না। প্রিয়ংব্রতর চোখের সামনে সব রঙগুলো আস্তে আস্তে মুছে গেল। মান্যতা মারা যাওয়ার পর আস্তে আস্তে মানুষ কমতে কমতে যখন এতবড় ফ্ল্যাটে প্রিয়ংব্রত একদম একা হয়ে গেল তখন সে আবিষ্কার করল একটা রঙ তার জীবনে রয়ে গেছে, সেটা হল সূর্যাস্তের রঙ।

প্রিয়ংব্রতর পৃথিবী:

জীবনে একটা জিনিসকে প্রাণ থেকে অপছন্দ করে এসেছি, সেটা হল দারিদ্র্য। খুব ছোটবেলায় দারিদ্র্য ছিল আমার পরিবারের নিত্য সঙ্গী, যদিও সেটা হওয়ার কথা ছিলনা। বাবা ছোটখাটো হলেও কেন্দ্রীয় সরকারের একটা চাকরি করতেন, কিছু জমিজায়গাও ছিল, আর সেই যুগে গ্রামাঞ্চলে বেঁচে থাকার খরচই বা কতটুকু! তবুও বাবার সংসারের ব্যাপারে উদাসীনতার কারণে অতগুলো ভাইবোনকে নিয়ে সংসার চালাতে মা-ঠাকুমা হিমশিম খেয়ে যেত। ওইটুকু বয়সেই এই ব্যাপারটা আমাকে খুব কষ্ট দিত। যখনই কষ্টটা বেড়ে অসহ্য হয়ে উঠত তখন মনে মনে বাবাকে কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে মা-ঠাকুমার হয়ে খুব ঝগড়া করতাম। বড় হয়েও বাবার সঙ্গে সম্পর্ক কখনও স্বাভাবিক হলনা। সংসারে যখন সচ্ছলতা এল তখন ঠাকুমা মারা গেছে, বাবার সাথে সম্পর্কটা দাঁড়ালো দূর সম্পর্কের কোনও আত্মীয়ের মত, মানে থাকলেও হয় আবার না থাকলেও কোনও আক্ষেপ থাকেনা। দারিদ্রকে সবচেয়ে বেশি অপছন্দ করি, অপছন্দ কেন ঘৃণাই বলতে পারি, কারণ আমার বাবা আমার ঠাকুমাকে দিনের পর দিন পেটভরে খেতে দিতে পারেনি। তখন আমাদের দুবেলা দুটো মিলের সংস্থান থাকলেও অধিকাংশ দিনই সকালের জলখাবারের কোনও ব্যবস্থা থাকতো না। আমার পঁচাত্তর বছরের ঠাকুমা রাত্রের নিজের খাবারের দুটো রুটি থেকে একটা রুটি পরেরদিনের জন্যে রেখে দিত। ভোরবেলায় ঘুম ভেঙে ঠাকুরের নাম জপ করে তার থেকে আধখানা খেয়ে বাকি আধখানা নাতি-নাতনীদের জন্য রেখে দিত। এ নিয়ে আমার মা বহুবার ঠাকুমাকে কথা শুনিয়েছে। আমার মা কিন্তু খারাপ মহিলা ছিলেন না, দারিদ্র্যই মানুষকে অসহিষ্ণু করে তোলে। কি জানি মা হয়তো মনে মনে ঠাকুরমার মৃত্যুকামনা করতো। হয়ত ভাবতো, একটা পেট কমে গেলে নিজের সন্তানদের পাতে আরেকটু বেশি খাবার তুলে দিতে পারবেন। আজ যখন চতুর্দিকে খাবারের প্রাচুর্য, তখন ঠাকুমা আমাকে বড় বেশি কাঁদায়।

লেখাপড়ায় মন ছিল তার জন্য বাবাকে মনে মনে ধন্যবাদ দিই। ওইটুকু বয়সেই বুঝে গেছিলাম, এ সংসার থেকে পাওয়ার কিছুই নেই, নিজের ভবিষ্যৎ নিজেকেই তৈরি করে নিতে হবে। আর এরকম একটা শৈশব আমাকে জেদি করে তুলল। এই জেদ পড়াশোনা শেষ করে একটা ভালো চাকরি জোটাতে সাহায্য করল বটে, তবে এই মানসিকতা সামাজিক ও চাকরি জীবনে আমার অনেক ক্ষতি করে দিল। আমার স্বভাবটা ছোটবেলা থেকেই রুক্ষ, পারসোনালিটি খুব হাই, বেশিরভাগ লোক সমীহ করে, কিন্তু ভালোবাসে না। ঘরে বাইরে এই সমীহটাই আমি সারাজীবন তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করেছি, ভালোবাসার ফাঁকিটাই ধরতে পারিনি। আর আমার আশেপাশের লোকজনের নিখুঁত অভিনয়ও আমাকে একটা ভুলের স্বর্গ রচনা করে বেঁচে থাকতে সাহায্য করেছিল।

আমার সেই রসকষহীন, কেঠো বাবার বুকে একটা লুকোনো নদী ছিল, সেটা আমি একদিন টের পেয়েছিলাম। কাউকে বলিনি, না মাকে না দাদাকে। ওটা আমার একান্ত আবিষ্কার, আমার উপলব্ধি, আমার ভালোলাগা। ওদের বললেও বুঝতো না।

ছেলেমেয়ে খুব বাধ্য, তাদের শাসন করেছি, আদর করেছি, ভেবেছি বাবা হিসেবে সব কর্তব্য সুচারুভাবে পালন করেছি, ছেলেমেয়ে আমাকে ভয়ও করে আবার ভালোবাসে, কিন্তু সেখানেও একটা বড় শূন্যতা আমার বোধের আড়ালে বাসা বেঁধেছিল। শুধু মাঝে মাঝে ধরা পড়ে যেতাম মান্যতার কাছে, ওর একটা শীতল, নিস্পন্দ পারসোনালিটি ছিল, যখন আমার কোনও কিছু ওর কাছে অসহনীয় হয়ে উঠত তখন দুতিনদিন সে এই বর্মটা পরে থাকতো। ওইসময় আমি ওর সামনাসামনি হলে কেমন কুঁকড়ে যেতাম। তখন আত্মসমালোচনা করিনি, আজ বুঝতে পারি আমিও আমার বাবার মত একজন ব্যর্থ স্বামী আর দায়িত্বজ্ঞানহীন বাবা।

অনিলিখার কবিতা:

আশ্চর্য বাবার মধ্যে এরকম একটা পাড় ভাঙা নদী আছে কখনও টের পাইনি। বাবাকে কোনওদিন গুনগুন করেও গান গাইতে শুনিনি। চিরকাল দেখে এসেছি একটা কেজো মানুষকে, ডিসিপ্লিন ডিসিপ্লিন করে বাড়িটাকে অফিস বানিয়ে রাখত আর পান থেকে চুন খসলেই মায়ের ওপর চোটপাট করত। আমি চুপ করে থাকলেও দাদা মিথ্যে গজরাত, তবে বাবার সামনে দাঁড়িয়ে প্রতিবাদ করার মত সাহস তার ছিলনা। মা যে একেবারেই কিছু বলতো না তা নয়, কিন্তু বাবা এমন খ্যাপা ষাঁড়ের মত চিৎকার করে উঠতো, মা পাড়াপড়শি, লোকলজ্জার ভয়ে চুপ করে যেত। মায়ের জন্য কষ্ট হলেও আমি বুঝতে পারতাম বাবারও ভেতরে কোথাও একটা ক্ষত আছে, সেখান থেকে মাঝেমাঝেই রক্ত ঝরে কিন্তু কাউকে বুঝতে দেয়না। বাবা আগে অফিস থেকে এসে মাঝে মাঝে ছাদে চলে যেত, আমার খুব ইচ্ছে করতো মা গিয়ে বাবার পাশে বসুক। মাকে বলতে গেলে মা বলতো, তোর বাবা পছন্দ করবে না, ও একাএকাই থাকতে ভালোবাসে। মা এমনভাবে জবাবটা দিত যে 'কেন' জিজ্ঞাসা করার ইচ্ছেটাই চলে যেত। আমি মাঝে মাঝে উঠে সিঁড়িঘরের অন্ধকারে লুকিয়ে দেখতাম বাবা কি করছে। একদিন চাঁদনি আলোর রাতে দেখেছি বাবার চোখে রুপোলি জল চিকচিক করছে।

বাবা চিরকাল কথাবার্তায়, পোশাক-পরিচ্ছদে ঝকঝকে, চকচকে থেকেছে, বাড়িতেও পাটভাঙা পাজামা-পাঞ্জাবী, বা ফতুয়া-লুঙ্গি, পার্টিতে স্যুট। তার পাশে মাকে বরঞ্চ খুব সাধারণ লাগতো। সকালে ওঠা থেকে শুরু করে রাত্রে শুতে যাওয়া পর্যন্ত আমাদের বাড়িতে একটা নিয়মের মধ্যে চলত। এই নিয়ম কেউ লিখিতভাবে ঘোষণা না করলেও আমরা জানতাম, আমাদের বাড়িতে সবটাই বাবার খুশিমতো হয়। আমার চুনোমাছ একদম ভালো লাগতোনা, ওটা বাবার ফেভারিট। বাড়িতে চুনো মাছটাই বেশি আসত, ভয়ে আমি বা দাদা কোনওদিন প্রতিবাদ করতে পারিনি। বাবা আমাদের নীরবে খেতে দেখে ভাবত আমরাও চুনোমাছের পোকা, ফলে আরও বেশি বেশি করে চুনোমাছ আসত। মা সব বুঝত তবে মুখে কিছু বলত না। যেদিন বাড়িতে চুনোমাছ আসত মা আমাদের স্কুলের টিফিন বক্সে একটার জায়গায় দুটো ডিম সেদ্ধ দিয়ে দিত।

আমার সেই রসকষহীন, কেঠো বাবার বুকে একটা লুকোনো নদী ছিল, সেটা আমি একদিন টের পেয়েছিলাম। কাউকে বলিনি, না মাকে না দাদাকে। ওটা আমার একান্ত আবিষ্কার, আমার উপলব্ধি, আমার ভালোলাগা। ওদের বললেও বুঝতো না। সেই নদীতে জোয়ার- ভাটা আসতো, নদীর জল বাষ্পীভূত হয়ে মাথার মধ্যে মেঘ হয়ে জমতো। তারপর কোনও একদিন গোটা মানুষটাকে নাড়িয়ে দিয়ে বৃষ্টি হয়ে ঝরে পড়ত। ঘটনাটা ঘটেছিল মাস্টার্সের থার্ড সেমিস্টারে। আমাদের ফিল্ড ট্রিপ ছিল ত্রিবান্দ্রাম আর কন্যাকুমারিকা।

নীলধ্বজের তরবারি:
ছোটবেলা থেকেই একটা অন্ধ রাগ শরীরের অলিতে-গলিতে মাথা খুঁড়ে বেড়াত। একদম ছোটবেলায় সেই অন্ধ আক্রোশের লক্ষ্যবস্তু ঠিক করে উঠতে পারতাম না, তবে রাগটা শরীর গরম করে তুলত। যত বড় হয়েছি, মাকে প্রায়শই চোখের জল মুছতে দেখেছি, তখন থেকে বাবাই আমার অপছন্দের মানুষের তালিকায় এক থেকে দশ নম্বর জায়গাটি জুড়ে ছিল। আমি ভাবতাম এত শক্তিশালী প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে আমার একটা অস্ত্র দরকার, তাই রথের মেলায় গিয়ে ইস্পাতের একটা তরবারি কিনেছিলাম। ছোটবেলায় স্কুল থেকে ফিরে আমার প্রথম কাজ ছিল তরবারিটা তেল মালিশ করে চকচকে রাখা। আমার ধারণা ছিল, যেকোনো দিন আমাকে রাত্রিবেলা যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে হবে, কারণ ওই লোকটা রাত্রিবেলায় বাড়ি ফেরে।

আমার মধ্যে মানুষটা সম্বন্ধে এতটা ঘৃণা জমে ছিল যে আমি আপ্রাণ পড়াশোনা করে ক্লাসে দারুন রেসাল্ট করতাম। কারণ ছোটবেলাতেই প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, যত তাড়াতাড়ি পারবো ওই লোকটার আর্থিক অনুদান থেকে নিজেকে মুক্ত করবো। কারণ, যে লোকটা আমার মাকে কাঁদিয়েছে সে কখনও ভালোমানুষ হতে পারেনা। কিন্তু আমার পড়াশোনার ব্যাপারে লোকটা অদ্ভুত দরাজহস্ত ছিল এবং আমার রেসাল্ট নিয়ে মাঝেসাঝে গর্ব করতেও শুনেছি। কিন্তু মানুষটা কখনও আমাকে কাছে ডেকে আমার গায়ে-মাথায় হাত বুলিয়ে দেয়নি, বা আমার কপালে চুমো খায়নি। প্রতি ক্লাসে ভালো রেসাল্ট করার পর কখনও জানতে চায়নি, আমার কি চাই! গিফ্ট দিয়েছে তবে নিজের পছন্দমতো, গিফ্ট যে যাকে দেওয়া হচ্ছে তার ইচ্ছেমতো দিতে হত সেই বোধটাই মানুষটার ছিলনা। তবে একটা ঘটনায় আমার এখনও খটকা লাগে। সেদিন স্কুলে ফুটবল টুর্নামেন্টের সেমিফাইনাল ছিল। আমি ক্লাস নাইন বি-র একমাত্র নির্ভরযোগ্য সেন্টার ফরোয়ার্ড। বিপক্ষ সেটা খুব ভালোভাবেই জানতো। আগের চারটে ম্যাচে আমার ছটা গোল ছিল, খেলা শুরুর পাঁচমিনিটের মধ্যে ইলেভেন সি-র সৌমকদা পা টা চালালো আমার সিনবোন বরাবর। মুহূর্তেই বুঝলাম চোট গুরুতর। বাড়িতে গিয়ে বিছানা নিলাম, ডাক্তার এসে প্লাস্টার করে পা টাকে একটা উঁচু প্ল্যাটফর্মে বেঁধে দিল। অসহ্য যন্ত্রনা, ডাক্তারবাবু একটা হাই ডোজের ঘুমের ওষুধ দিলেন। ঘুমিয়ে পড়ার পর মা আর বোন নিজের ঘরে শুতে চলে গেল। কিন্তু কেন জানি আমার মনে হল সারারাত ধরে কেউ আমার পা-হাত-মাথা-বুক সারা শরীরে অনলস হাত বুলিয়ে গেল। কে বুঝতে পারিনি! কারণ পিতৃস্নেহ কাকে বলে কোনওদিন জানতে পারিনি।

মান্যতার সংসার:
বিএ অনার্সের পরীক্ষার ঠিক তিনমাস আগে বিয়ে ঠিক হয়ে গেল। পাত্র বিশাল চাকুরে, হ্যান্ডসাম ছ ফুটের ওপর চেহারা, সবথেকে বড় কথা ছেলের কোনও পিছুটান নেই। বাবা-মা এরকম সম্বন্ধ পেয়ে পাগল হয়ে গেল, আর প্রিয় কিভাবে যেন বিয়ের আগে আমার বাবা-মাকে বশ করেছিল। বাবা-মা তাদের মেয়েকে কৃতি জামাইয়ের হাতে তুলে এতটাই নিশ্চিন্তি হয়ে পড়েছিল যে বিয়ের বছর পূরতে না পূরতেই দুজনেই পার্থিব মায়া কাটিয়ে অমর্ত্যধামের উদ্দেশ্যে পাড়ি জমালো।

বিয়ের পর আমার সমস্যা হল মানুষটার মেজাজ। আমাদের বাড়িতে বাবা-মা দুজনেই ছিলেন ঠান্ডা প্রকৃতির মানুষ। বাবা-মায়ের যে মনোমালিন্য হতনা বলবোনা, কিন্তু কাউকে কখনও চিৎকার করে ঝগড়া করতে দেখিনি, যেটা এই বাড়ির নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। প্রিয়র একটা অদ্ভুত ডমিনেটিং নেচার ছিল, যার কাছে সমর্পণ না করার অর্থ হল যুদ্ধ কিংবা ডিভোর্স। বাবা-মায়ের শেখানো শিক্ষায় মানতে মানতে দুটো শিশুর জন্ম হল, কালের নিয়মে তারা বড় হল। কিন্তু এত বছরে দুজনের মধ্যে কোনও প্রেম দানা বাঁধলো না। এ যেন অনেকটা শর্তসাপেক্ষ একসাথে বেঁচে থাকার প্রতিজ্ঞা। তবে লোকটাকে মাঝে মাঝে অচেনা মনে হত, বিশেষ করে অফিসের ট্যুর থেকে ফিরে লোকটা কেমন যেন বদলে যেত। অল্পবয়সে অনেক অলীক সন্দেহে মনটা বিক্ষিপ্ত হত, বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে এটা নিয়ে ভাবনাটাই ছেড়ে দিলাম।
এই হাউসিংয়ে তিন বছর হয়ে গেল, প্রথম থেকেই এখানকার সূর্যাস্ত আমায় টানে। প্রথম প্রথম বিরক্ত হলেও পরের দিকে বিকেল সন্ধ্যের বুকে মুখ লুকোনোর প্রাক্কালে প্রিয় ঘুমভাঙা চোখে আমার পাশে এসে বসত। আদ্যন্ত প্রকৃতিপ্রেমিক মানুষটা মনে হত উপভোগ করত। সেদিন বিকেল থেকে আমার হজমের সমস্যা চরম হয়ে উঠেছিল, কিন্তু প্রিয়কে আমি কিছু বলিনি কারণ ওদিন ওর ঠাকুমার মৃত্যুবার্ষিকী ছিল। রাত্রে কিছু খেলাম না, শরীর প্রচন্ড আনচান করছিল, লক্ষ্য করলাম প্রিয় খুব উদাসীন, অফিস থেকে ফিরে ঠাকুমার ছবিটা নিজের হাতে চন্দন দিয়ে সাজিয়েছে, মালা পরিয়েছে। বুঝতে পারছিলাম আমার সময় হয়ে আসছে কিন্তু প্রিয়কে ডিস্টার্ব করতে চাইনি, জানতাম ও আমার থেকেও বড় অসহায়।

প্রিয়ংব্রতর উপসংহার:
আজ আকাশ একদম মেঘশূন্য। বর্ষা কেটে গেছে, শরতের খুনসুটি মেঘ এখনও আকাশে তাদের সাদা-নীল ভেলা ভাসায়নি, কিন্তু একটা অদ্ভুত ঔজ্জ্বল্য চারপাশ একেবারে নীল পলাশের ঝালরে পরিষ্কার ঝকঝকে তকতকে করে তুলেছে। টাটা ক্যানসার হাসপাতালের বায়ু কোণ থেকে শেষ সূর্যের কামরাঙা রঙ ভাসিয়ে দিচ্ছে তোমার মুখ। তুমি মুখের ওপর হাত রাখলেই সেই তেজস্ক্রিয় টের পাবে। ওটা প্রতি সেকেন্ডে বাড়তে বাড়তে অযুত হয়ে ভেসে বেড়াচ্ছে পূব থেকে পশ্চিম, নৈঋত-অগ্নি হয়ে আমাদের ঘর-গেরস্থালি উঠোন-অন্দর জুড়ে। এইমাত্র সূর্য ডুবে গেল...জানিনা কাল আমার সূর্য উঠবে কিনা! যদি ওঠে একটা গরম চায়ের কাপ নিয়ে কম্পিত পায়ে ব্যালকনিতে গিয়ে বসবো সূর্যাস্তের প্রতীক্ষায়।

কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

ছাইলিপিতে গল্প পাঠান

ছাইলিপি সাহিত্য সাময়িকীর সাপ্তাহিক সংখ্যায় পাঠাতে পারেন আপনার লেখা ছোটগল্প, অণুগল্প, ধারাবাহিক গল্প, রম্যগল্প, রহস্য গল্প, ভৌতিক গল্প। লেখা পাঠানোর সময় দুটি বিষয় মাথায় রাখতে হবে- ১. বানান হতে হবে নির্ভুল ২.অনাধিক ১৫০০ শব্দে লিখতে হবে গল্প। ওয়ার্ড ডকুমেন্ট করে পাঠিয়ে দিন আমাদের জিমেইল ঠিকানায়।

chailipimagazine@gmail.com

ছোটগল্প

একজন কিংশুক এবং প্রেমিকাগণ

পার্থসারথি

নীরবতা ভেঙে কিংশুক বলে- হাবিব আমার জন্যে অপেক্ষা করছে। এখনই রওনা হতে হবে। যাবার বেলায় শুধু একবার হাসো। তোমার হাসিমাখা মুখটুকু নিয়েই আমি যুদ্ধে যেতে চাই।
নিরুপমা অশ্রুসিক্ত চোখে হাসতে হাসতে কিংশুককে কাছে টেনে ভালোবাসার চুম্বন বসিয়ে দেয়।

ইশ! এবারের শীতটা মনে হয় একটু বেশিই পড়েছে।– এই বলেই কিংশুক বাবু স্ত্রী সুক্তিপ্রিয়াকে আরও জড়িয়ে ধরতে যায়।
হালকা এক মুখ-ঝামটা দিয়ে সুক্তিপ্রিয়া বলেন- আমি কী কম্বল? ফায়ার প্লেস, হ্যাঁ?
তুমি আমার সব। ফায়ার প্লেস বলো, কম্বল বলো আর সম্বলই বলো- তুমিই আমার সব, বুঝলে!- কিংশুক বাবু সুক্তিপ্রিয়ার নরম তুলতুলে বুকের ভেতর হাত বাড়াতে যায়।
দু'হাতে বেড়িবাঁধ তৈরি করে সুক্তিপ্রিয়া বলেন- এই বুইড়া বয়সে তোমার ভীমরতি হয়েছে নাকি!
আহ! তুমি অমন করছো কেন?- বলেই একটু বল প্রয়োগ করে ডান হাতটা সুক্তিপ্রিয়ার বুকের নরম গদিতে বিছিয়ে ওম নিতে থাকে। সুক্তিপ্রিয়া আর বাঁধা দেননি। তবে সাবধান করে দিয়ে বলেন- এই যে মিস্টার বুড়ো, এই পর্যন্তই থেকো আর আগ বাড়তে চেষ্টা করো না।
কিংশুক বাবু বিড়ালের বাচ্চার মতো চোখ জোড়া পিটপিট করে তাকাচ্ছে স্ত্রীর দিকে। এখনও ঘরের আলো নেভানো হয়নি। এটা ওদের অভ্যেস- ঘুমানোর আগে মিনিট কুড়ি আলো জ্বালিয়ে খোশগল্প করা। তারপর ঘুমের রাজ্যে ডুব দেয়া।
সুক্তিপ্রিয়া কিংশুক বাবুর চোখে চোখ ফেলে বলেন- তুমি বিড়ালের বাচ্চার মতো অমন চোখ পিটপিট করছো কেন?
ভালো লাগছে তাই। আহ! কী শান্তি।
শান্তি না, ছাই! আমার ওসব এখন আর ভালো লাগে না।
উত্তরে কিংশুক বাবু নির্বিকার।
হাতটা একটু নড়াচড়া করতেই সুক্তিপ্রিয়া শাসনের সুরে বলেন- এই যে মহাশয় আর এগোনো চলবে না। আমি কিন্তু বাড়া ভাতে ছাই ঢেলে দেবো। যতটুকু পাচ্ছো তা'তেই সন্তুষ্ট থাকো।
মুচকি হেসে কিংশুক বাবু বলেন- আরে তুমি ভয় পাচ্ছো কেন?
ভয় পাবার কী আছে? ওসব আমার এখন একদম ভালো লাগে না। বিরক্ত লাগে!
কিংশুক বাবু মুচকি হেসে বলেন- ঠিকই বলেছো, এখন আর তেমন মধুময় লাগে না। লবণ ছাড়া সাদা ভাতের মতো লাগে।– এই বলেই সুক্তিপ্রিয়ার উরুর ভেতর কিংশুক বাবু একখান পা ডুবিয়ে দিলেন।
সুক্তিপ্রিয়া আর কোন কথা না বাড়িয়ে বললেন- আর কোন ডিস্টার্ব করো না এখন। শান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়ো।
ঠিক আছে। আর কোন বিরক্ত করবো না।– বলেই আলোটা নিভিয়েই ডীমলাইটটা জ্বালিয়ে দিলেন কিংশুক বাবু। তারপর স্ত্রীকে টেনে বুকের মধ্যে নিয়ে ওম নিতে থাকেন। মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই স্ত্রী সুক্তিপ্রিয়া ঘুমের রাজ্যে ডুবে গেলেন। দেখতে দেখতে শান্ত, স্নিগ্ধ, অপরূপা লাগছে। দেখতে লাগছে ঠিক- জীবনে না-দেখা পরীর মতো। সকল চঞ্চলতা এখন নিবিড় শান্ত হয়ে লুটোপুটি খাচ্ছে সুক্তিপ্রিয়ার মুখমণ্ডলে। আবছা আলোয় সত্যিই স্বর্গীয় মনে হচ্ছে।
কিংশুক বাবু মুগ্ধ নয়নে স্ত্রীকে দেখছেন আর ভাবছেন নানান কথা; মানুষ সত্যিই বিচিত্র। জেগে থাকা মানুষের রূপ এক বিচিত্ররূপের সমাহারে সমৃদ্ধ আবার ঘুমের মধ্যে বদলে যায় তার সকল চঞ্চলতা। এক স্বর্গীয় অবয়ব চেহারায় ফুটে থাকে। ঘুমন্ত সকল মানুষকেই নিশ্চয়ই এমন মনে হয়। ঘুমের মধ্যেই সুক্তিপ্রিয়া মুচকি হেসে ওঠলেন। কিংশুক বাবুর বুকের ভেতরটা দুমড়ে-মুচড়ে একাকার; এই মুচকি হাসিতেই যেন সুক্তিপ্রিয়াকে অন্যরকম মনে হচ্ছে।
মুহূর্তেই নিরুপমা এসে মনের ভেতর হামলে পড়লো...
কিংশুকের গ্রীবায় আলতো ছুঁয়ে নিরুপমা বলল- তোমাকে দেখতে দেখতে আমি পাগল হয়ে যাবো!
আমি দেখতে আর তেমন হলাম কোথায়?- কিংশুক মুচকি হেসে বলে।
নিরুপমা একগাল স্নিগ্ধ হাসি ছড়িয়ে বলে- তুমি আমার কাছে রূপকথার রাজপুত্তুর।– বলেই একদৃষ্টে চোখে চোখ রেখে তাকিয়ে থাকে।
পড়ন্ত দুপুর। গাছের মগডালে ঘুঘু পাখিটা নিশ্চিন্তে মধুর কণ্ঠে ডেকেই চলছে। আর মনপ্রাণ ব্যাকুল করে দিচ্ছে ঝিরিঝিরি বাতাসের ছোঁয়ায়। এই স্থানটা একটু নির্জন। গ্রামের পাশেই কিন্তু কিছুটা দূরে; বিলের পাশেই পড়ে থাকা বাগানবাড়ি। লোকজনের আনাগোনা নেই বললেই চলে। পাশেই পদ্মবিলে হাজার রকমের জলপদ্ম ফুটে আছে। যেন খুশীর জোয়ার বইছে চারদিকে। নিরুপমা নিজেকে আর সামলাতে পারলো না- আচমকা এক চুমু বসিয়ে দিলো কিংশুকের কপোলে।
কিংশুক থরথর কাঁপছে। হাসির ঝর্ণা আকাশে-বাতাসে ছড়িয়ে দিয়ে নিরুপমা বলে- তুমি অমন ভয় পাচ্ছো কেন?
কিংশুক কম্পিত কণ্ঠে বলে- যদি কেউ দেখে ফেলে, তবে!
চোখ দুটো হরিণীর মতো টেনে টেনে নিরুপমা বলে- তুমি আমাকে ভালোবাসো না?
হ্যাঁ, খুব ভালোবাসি।
তাহলে ভয় কিসের?
না, মানে...।– কিংশুক কম্পিত কণ্ঠেই বলতে চেষ্টা করে।
কোন মানে নেই।– বলেই নিজের কপোল দেখিয়ে নিরুপমা আবারও বলে- তুমি একখান দাও।
কিংশুক যেন আচমকা আকাশ থেকে ছিটকে পড়লো। চোখ জোড়া বড়বড় করে আশ্চর্যভরা দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো।
অমন হা করে কী দেখছো?- নিরুপমার হাসিতে যে বনের পাখিরা মিষ্টিসুরে গেয়ে ওঠল- তোমরা খুশীতে মেতে যাও!
কিংশুক এখনও সম্বিৎ ফিরে পায়নি। একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে- সকল ভালোবাসা, ভালোলাগা, মুগ্ধতা আর স্নিগ্ধতা যেন ওকে পুরোপুরি গ্রাস করে নিয়েছে। সে খুশীতে আর আনন্দে হতবিহ্বল।
অভিমানী কণ্ঠে নিরুপমা বলে- তুমি যদি আমার ভালোবাসাটুকু আমাকে না ফিরিয়ে দিচ্ছো তাহলে ধরে নেবো, তুমি আমাকে ভালোবাসো না।
কিংশুক লাজুক চোখে চারপাশে তাকাচ্ছে আর আমতা আমতা করছে- কিন্তু!
কোন কিন্তু নয়।– অভিমানী নিরুপমা গাল ফুলিয়ে ঘাসের বুকে তাকিয়ে রইলো।
হঠাৎ কম্পিত ঠোঁটের স্পর্শে নিরুপমা নিজেকে আর সামলাতে পারলো না। দু'হাতে কিংশুককে জড়িয়ে ধরলো। দু'জন স্বর্গীয় ভালোবাসার মোহনায় ভেসে কিছুক্ষণ নিঃস্তব্ধ। জীবনের প্রথম চুম্বন আর পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে থাকা এক স্বর্গীয় সুখ। এখন দু'জনই লাজুক দৃষ্টিতে ঘাসের বুকে চিমটি কাটছে।
সেই থেকে নিরুপমা আর কিংশুক ভালোবাসার ইন্দ্রজালে আবদ্ধ। একজন অন্যজনকে ছাড়া জীবনকে কল্পনাই করতে পারে না। ওদের নিঃশ্বাসে নিঃশ্বাসে ভালোবাসার রঙ ছড়ায় প্রতিক্ষণে।
*
অন্য এক বিকেল। এই এখানে ওরাই দু'জন। কিন্তু নিরুপমার মনে হাসি নেই। কিংশুকের কাঁধে ঝুলছে ব্যাগ। নত মস্তকে দু'জনই চুপচাপ দাঁড়িয়ে। নীরবতা ভেঙে কিংশুক বলে- লক্ষীটি আমার, তুমি মন খারাপ করো না। যুদ্ধে আমরা না গেলে দেশ কেমনে স্বাধীন হবে!
অনেকেই যাচ্ছে। তুমি না গেলেও চলবে।– বলেই কিংশুকের একটা হাত টেনে ধরে।
না, নিরুপমা। এই আমার মতো আমাকে নিয়েই তো অনেকে। আমি চুপচাপ বসে থাকলে চলবে না। আমি বাড়িতে কিছুই বলে আসিনি। মা খুব কান্নাকাটি করবে।
নিরুপমা অবাক নয়নে তাকায়- এ তো সেই কিংশুক নয়। অন্য এক কিংশুক; বুক টান করা যোদ্ধা কিংশুক। ওকে ফেরানো যাবে না। তবুও দু'হাতে কিংশুকের হাত চেপে ধরে বলে- তোমাকে ছাড়া আমি কীভাবে থাকবো।
এইতো যাবো, দেশ স্বাধীন করেই ফিরে চলে আসবো।– কিংশুকের দীপ্ত উচ্চারণ।
নিরুপমা চুপচাপ। অশ্রুজল দু'নয়নের কোণ বেয়ে টপটপ করে পড়ছে।
শোন লক্ষীটি, কান্না করো না। দেখবে আমার কিচ্ছু হবে না।
নিরুপমা এবার ডুকরে কেঁদে ওঠলো।
তুমি অমন করছো কেন?
আনন্দে আর ভালোলাগায়।– বলেই নিরুপমা কিংশুককে জড়িয়ে ধরে। আর জড়িয়ে ধরেই সোহাগী কণ্ঠে বলে- কিংশুক, তোমাকে আমি শুধু ভালোইবাসি না, আজ থেকে আমার বুকের ভেতর শ্রদ্ধার আসনেও বসালাম।
তুমি আমার ছিলে, আছো এবং থাকবে। তুমি যুদ্ধে যাও। আর কোন চিন্তা করো না। তোমার মাকে আমি দেখে রাখবো।
নিরুপমাকে দু'হাতে চোখের সামনে টেনে এনে আশ্চর্যভরা দৃষ্টিতে তাকায়।
হ্যাঁ, আমি বলছি।
এবার কিংশুক নিজেকে আর সামলাতে পারলো না।
নিরুপমাকে বুকে টেনে নিয়ে বলে- আমি জানতাম, তুমি আমাকে আটকাবে না।
নিরুপমা মনে মনে ভাবে- তোমাকে আর কে আটকাবে! মায়ের বাঁধনই যেখানে তোমাকে আটকাতে পারেনি!

নীরবতা ভেঙে কিংশুক বলে- হাবিব আমার জন্যে অপেক্ষা করছে। এখনই রওনা হতে হবে। যাবার বেলায় শুধু একবার হাসো। তোমার হাসিমাখা মুখটুকু নিয়েই আমি যুদ্ধে যেতে চাই।
নিরুপমা অশ্রুসিক্ত চোখে হাসতে হাসতে কিংশুককে কাছে টেনে ভালোবাসার চুম্বন বসিয়ে দেয়।
উজ্জীবিত কিংশুক বুকখান টান টান করে পা ফেলে এগিয়ে চলে যায় যুদ্ধে। আর একবারও পেছন ফিরে তাকায়নি।
বাড়ি ফিরতি পথে নিরুপমা কাবিল মিয়ার মুখোমুখি হয়। কোন কিছু না-বলেই নিরুপমা চলে যাচ্ছিল। কাবিল মিয়ার ডাকে সে দাঁড়ায়।
কোথায় গিয়েছিলে মা নিরুপমা?- বলেই হাতের পদ্মজোড়ায় তাকায়।
চাচা, আমি বিলে গিয়েছিলাম। হাতে পদ্মফুল দেখছি। একেবারে ফুটন্ত পদ্মফুল। তা'ও আবার একজোড়া। বাড়িতে পূজা আছে বুঝি!- কাবিল মিয়া মিষ্টি-দুষ্ট হাসি হেসেই যাচ্ছে।
ম্লান মুখে নিরুপমা বলে- হ্যাঁ চাচা। নৌকায় করে ওটা কে গেল? মহীতোষ মাস্টারের ছেলে বুঝি?- বলেই উত্তরের অপেক্ষায় তাকিয়ে থাকে।
আমি জানি না চাচা। আমার দেরি হয়ে যাচ্ছে, আমি আসি চাচা।– এই বলে নিরুপমা আর দাঁড়ায় না।
কাবিল মিয়া নীরব দৃষ্টিতে নিরুপমার চলে যাওয়ার পথে তাকিয়ে থাকে। আর মনে মনে যেন কী ভাবে... সে-ই জানে।

ছাইলিপি

পাঁচ মাস পর...
হাবিব ও কিংশুক পাশাপাশি হাঁটছে বীরের বেশে। দু'জনের কাঁধেই বন্দুক, রুগ্ন চেহারা, মলিন পোষাক কিন্তু চোখ-মুখ খুশীতে জ্বলজ্বল করছে। দূর থেকেই দেখতে পেল গ্রামের মুখেই বাঁশের খুঁটিতে নতুন দেশের স্বাধীন পতাকা পতপত করে ওড়ছে। দেখেই ওদের মনপ্রাণ জুড়িয়ে এল। একজন অন্যজনের দিকে তাকিয়ে তৃপ্তির হাসি ছড়িয়ে দেয়। বুকের ভেতর চেপে থাকা কষ্ট আর ক্ষত কিছুটা হলেও লাগব হয়ে আসে। আসতে আসতে গ্রাম বাংলার বিধ্বস্ত চেহারা দেখতে দেখতে বুকের পাঁজর যেন ক্ষতবিক্ষত হয়ে আসছিল। এই পতপত করে ওড়তে থাকা পতাকাটাই যেন সব দুঃখ-কষ্ট ভুলিয়ে দিলো। কিন্তু গ্রামের বুকে পা রেখেই দু'জন নিঃশব্দ, নিঃস্তব্ধ ও নির্বিকার।
নিরুপমা নিজের ভেতর অন্য এক প্রাণের উপস্থিতি টের পায়। মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ে। কানে বারবার বেজে ওঠে পাকসেনার শেষ কথাটা- কাবিল মিয়া, মেয়েটাকে সসম্মানে বাড়িতে ছেড়ে এসো।
কাবিল মিয়া অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে।
জোরে ধমক দিয়ে পাকসেনা বলে- যা বলছি তাই কর। বীজ ঢুকিয়ে দিয়েছি। আমাদের বীজ এখানে ছড়িয়ে পড়ুক। ওরা আমাদের রক্তের টানই টানবে। কিন্তু হুজুর!- কাবিল মিয়া বেশ নিরাশ হয়েই বলে।
কোন কিন্তু নয়। যাও ওকে ওর বাড়িতে রেখে এসো!

বিপর্যস্ত নিরুপমা শূন্য দৃষ্টিতে শূন্য স্থানে অপলক দৃষ্টিতে কষ্টের নিঃশ্বাস ফেলে। এখন বেঁচে থাকাটাই জীবনের প্রতিক্ষণের বোঝা। কিন্তু নিজেকে কোনভাবেই ধাতস্থ করতে পারছে না; চোখের সামনে এমন শত শত ধর্ষিতা নারীর ক্ষত-বিক্ষত জীবন্মৃত চেহারা বুকের ভেতর কাঁপন তুলে। নির্যাতনের মাত্রা দেখলে কোন সুস্থ মানুষই বেঁচে থাকার কথা নয়। আর বেশির ভাগ মানুষকেই বুলেট আর বেয়নেটের আঘাতে মরতে হচ্ছে। নিরুপমা জানে না কেন তাকে ছেড়ে দেয়া হচ্ছে। সে-তো কিংশুকের কোন ইনফরমেশনই দেয়নি। অত্যাচারের চরমসীমায়ও সে একদম চুপচাপ ছিল।
পাকসেনার ধমকে কাবিল মিয়া নিরুপমাকে টেনে নিয়ে চলে আসে নিজের বাংলোয়। সারারাত নিজের কাছে রেখে ভোর বেলায় ওদের বাড়ির উঠানে ফেলে আসে।
মায়ের আদরে-সোহাগে আর বাবার অসহায় দৃষ্টির দিকে তাকিয়ে নিরুপমা সব ভুলতে চেষ্টা করে। কিংশুকের ভালোবাসার কথা ভেবে নিজেকে সামলে নেয়। কিন্তু যখনই নিজের ভেতর অন্য একটি প্রাণের টের পায় তখন নিরুপায় নিরুপমা নিজেকে আর সামলাতে পারেনি।
লাশটা এখনও গাছে ঝুলছে। হাবিব ও কিংশুক ভীতসন্ত্রস্ত পায়ে কাছে এগিয়ে আসে। মাটিতে হাঁটু গেঁড়ে বসে কিংশুক কান্নায় ভেঙে পড়ে। হাবিব কিংশুকের কাঁধে হাত রেখে বুক টান টান করে বলে- কোন্ শুয়োরের বাচ্চা এমন সর্বনাশ করল।
কানাঘুষায় সব কারণই জানতে পারল নিরুপমার এমন পরিস্থিতির জন্য।
হাবিব কিংশুকের বন্দুকটা ওর হাতে তুলে দিয়ে বলে- চল, আমার সাথে চল!
হাবিব কিংশুককে টেনে নিয়ে চলে। নির্বাক-নিঃস্তব্ধ কিংশুক হাবিবের টানে টানে হেঁটে চলে। আর চোখ জোড়ায় যেন দৃষ্টি নেই বললেই চলে। হাবিবদের বাড়ির উঠানের সামনে বসেই কাবিল মিয়ার মুখোমুখি হয় ওরা।
কাবিল মিয়া দৌঁড়ে এগিয়ে আসে। আর কাঁদু কাঁদু হয়ে বলে- আমার আব্বাজান! আব্বাজান আমার! ফিরে এসেছো!
সাবধান! আমাকে ছোঁবে না তুমি।– এই বলেই হাবিব কয়েক কদম পিছিয়ে আসে। কাবিল মিয়া অবাক হয়ে তাকায় এবং বলে- কেন আব্বাজান! কথার কোন জবাব না দিয়েই হাবিব কাবিল মিয়ার এক হাত টেনে ধরে টেনে-হেঁছড়ে নিয়ে চলে।
আব্বাজান! তোমার কী হয়েছে?- কাবিল মিয়ার চোখ জোড়া প্রায় কপালে ওঠার উপক্রম। কিংশুকও ভাষাহীন এবং চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে।
হাবিব ডাক দেয়- কিংশুক দাঁড়িয়ে আছিস কেন? আমার সাথে আয়।
কিংশুক কাঁপা কাঁপা কন্ঠে বলে- উনি তোর বাবা হন।
কাবিল মিয়া কাতর কন্ঠে বলেন- হ্যাঁ আব্বাজান, আমি তোমার বাবা হই!
কোন কথা না বলে হাবিব ওর আব্বাকে টেনে হেঁছড়ে নিয়ে চলে।
তারপর চলে আসে ঝুলন্ত নিরুপমার লাশের কাছে। লাশটা দেখিয়ে হাবিব বলে- ওকে চিনতে পারছো আব্বাজান!
একবার তাকিয়েই কাবিল মিয়া দৃষ্টি সরিয়ে নিয়ে আসে এবং একদলা থুথু ফেলে বলে- ওটাতো নষ্টা মেয়েছেলে।

হাবিব নিজেকে আর সামলাতে পারলো না- ওটা নষ্ট মেয়ে! না? ওটা নষ্ট মেয়ে! কে নষ্ট করেছে?- বলেই এক ধাক্কায় কাবিল মিয়াকে মাটিতে ফেলে দিল। তারপর দীপ্ত কন্ঠে কিংশুককে বলল- নে... এবার গুলি চালা!
কিংশুক অবাক হতেও অবাক হচ্ছে। নিজের কানকেও বিশ্বাস করতে পারছে না। তাই বলে নিজের বাবাকে মারবি!
হাবিবের স্পষ্ট উচ্চারণ- শরীরের কোন অংশ পঁচে গেলে কেটে ফেলাই উচিত। নয়তো সারা শরীরে পচন ধরবে। আর সে আমার আব্বা হতেই পারে না। আমি স্বীকার করি না। নে... গুলি চালা এবার!
কিংশুকের দৃষ্টি অবনত হয়ে আসে। কিন্তু হাবিব নিঃস্তব্ধতা ভেঙে ট্রিগারে আঙুল চাপে... কাবিল মিয়া মাটিতে লুটিয়ে পড়েন।
তাই বলে তোর আব্বাকে মেরে ফেললি!
সে আমার আব্বা হবার যোগ্য নয়। আর ওদের বাঁচিয়ে রাখলে দেশটা শেষ করে ফেলবে। আগাছা অংকুরেই বিনাশ করা ভালো।
কিংশুক হাবিবকে জড়িয়ে ধরে কান্নায় ভেঙে পড়ে।

ঈশ্বর বলেন, অদৃশ্য শক্তিই বলেন আর কিংবা প্রকৃতির নিয়ম- সময়ের স্রোত বেয়ে হেঁটে চলতে চলতে মানুষের কষ্টগুলো হালকা হ'তে থাকে। নিরুপমাকে হারানোর বেদনা ভুলতে কিংশুকের দীর্ঘ সময় লেগেছে।
বিশ্ববিদ্যালয় জীবনে এসেও নিরুপমার স্মৃতি আঁকড়ে বেড়াচ্ছে কিংশুক। সেই হাসিমাখা, লাবণ্যভরা আর মুগ্ধ ভালোবাসা ঘেরা চোখ জোড়া এখনও ক্ষণে ক্ষণে মনের ভেতর ভেসে ওঠে। জীবনের প্রথম চুম্বনের আবেশভরা স্মৃতিটুকু এখনও তাড়া করে, আবেগাপ্লুত করে। একটা মোহাচ্ছন্নতায় আটকে আছে সে।
সেন্ট্রাল লাইব্রেরির কোণে গাছতলায় বসে আপন মনে সিগারেট টানছিল কিংশুক; আচমকা একটা কন্ঠস্বর ওর দৃষ্টি কেড়ে নিল- তাকিয়েই হতবাক, বাকহীন, অপলক তাকিয়ে আছে সে; একি সত্যি দেখছি!- স্বগোক্তি করে কিংশুক নিজের গায়ে চিমটি কাটে- সত্যিই তো!
এক দৌঁড়ে এগিয়ে গিয়ে মেয়েটার পথ আগলে দাঁড়ায় কিংশুক- নিরুপমা! তুমি এখানে?
মেয়েটি অবাক হয়ে শুধু তাকিয়েই থাকে। কোন কথা বলে না।
কিংশুক আবারও বলে- নিরুপমা! তুমি এখানে?
মেয়েটি এবার কথা বলে- আমি অনুসূয়া।
নিরুপমা... নিরুপমা... নিরুপমা... কিংশুক মনে মনে বারবার আওড়ায়।
আপনার কোথাও ভুল হচ্ছে। ও হচ্ছে অনসূয়া।– সাথের মেয়েটি ভুল ভাঙাতে বলে।
আর কোন কথা না বলে ওরা চলে যায়।
কিংশুক ঠায় দাঁড়িয়ে। আর মনে মনে ভাবে- এটা কী করে সম্ভব! দেখতে হুবহু এক! নাক, চোখ, মুখ, চুল, গায়ের রঙ, চাহনি এমনকি কন্ঠস্বর সবইতো এক। আর নিরুপমাতো নেই। তাহলে এখানে এলো কী করে! হয়তো আমারই ভুল। অনেকেই বলে- ঈশ্বর নাকি প্রতিটি মানুষ এক জোড়া করে পাঠিয়েছে; জোড়াটিকে দেখতে প্রায় এক। হবে হয়তো।– ভাবতে ভাবতে আরেকটা সিগারেট ধরায় কিংশুক। সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে একটা ঘোরের মধ্যেই আটকে থাকে সে। সিগারেটের পর সিগারেট শেষ করে কিন্তু ঘোরটা এখনও কাটছে না। কখন দুপুর গড়িয়ে গেছে টেরই পায়নি। ভীষণ ক্ষুধা পেয়েছে কিন্তু এখান থেকে একদম উঠতে মন চাচ্ছে না। বাদামওয়ালাকে ডেকে এক প্যাকেট বাদাম কিনে নিলো। বাদাম টিপে খাচ্ছে আর সিগারেটে দম বসাচ্ছে। মেয়েটি নিরুপমা নয়, অনুসূয়া... !- ভাবছে আর সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়ছে।
ক্লাস শেষে বান্ধবীদের সঙ্গেই ঢাকসু ক্যাফেটেরিয়াতেই দুপুরের খাবার খেয়ে সোজা লাইব্রেরিতে ঢুকেছিল অনুসূয়া। লাইব্রেরি থেকে বের হতে হতে প্রায় চারটা বেজে গেল। লাইব্রেরির বারান্দা থেকে নেমে বারান্দার সামনে দিয়েই হেঁটে চলছিল অনুসূয়া। বাদাম ফাটিয়ে যেই-না ফু দিতে যাবে অমনি কিংশুকের দৃষ্টি অনুসূয়ার দৃষ্টিতে আটকে গেল। কিংশুক উঠে দাঁড়িয়ে বলল- এতক্ষণে ফিরলেন?
অনুসূয়া অবাক হয়ে বলে- মানে!
কিংশুক বুঝতে পারে যে, সে চিনতে পারেনি। তাই বলে!- মনে মনে উচ্চারণ করে বলে- আমাকে চিনতে পারেননি?
অনুসূয়া বেশ শান্তভাবেই বলল- না মানে, আপনাকে ঠিক চিনতে পারিনি।
আমি সেই... সকালে আপনাকে নিরুপমা ভেবে ভুল করেছিলাম।
ও... হ্যাঁ মনে পড়েছে।– বলেই চলে যেতে চাচ্ছিল অনুসূয়া।
যদি কিছু মনে না করেন, আপনার সাথে কিছু কথা বলতে চাই।
অনুসূয়া দাঁড়ায় না। হাঁটতে হাঁটতেই বলে- আপনার সাথেতো আমার কোন পরিচয় নেই।
আমি জানি। আপনার কোন কথা নেই। কিন্তু যদি কিছু মনে না করেন...।– কিংশুক অনুরোধ করে বলে।
অনুসূয়া হাঁটতে থাকে।
কিংশুক আর কোন কথা না-বাড়িয়ে বলে- ঠিক আছে। আমার মনে হয় আপনি এখন একটু ব্যস্ত আছেন। পরবর্তীতে কথা হবে। আমি কিংশুক চৌধুরী। এখানেই আপনার জন্যে অপেক্ষা করবো। আর কোন কথা বাড়ায় না সে। অনুসূয়া কোন জবাব না দিয়ে চুপচাপ হেঁটে চলে যায়।
রুমে ফিরে আসার পর থেকেই অনুসূয়ার মনটা অস্বস্তিতে আঁকুপাঁকু করতে লাগলো। ছেলেটির সাথে এমন ব্যবহার করা উচিত হয়নি। শোনা উচিত ছিল... কী বলতে চাচ্ছিল। ঘুরেফিরে বারবার একই কথা মনের ভেতর উঁকি দিচ্ছে। একটা অস্বস্তির ব্যামো নিয়েই সারাটা বিকেল রুমের ভেতরই কাটিয়ে দিল। সন্ধ্যার পর লেখাপড়াতেও মন বসাতে পারেনি। কোনকিছুতেই তার মন বসছে না। এমনটা কেন হচ্ছে এর কোন কারণও বের করতে পারছে না। শুধু একটা কথাই কানে বাজছে- ‰আমি এখানেই আপনার জন্যে অপেক্ষা করবো।' নিজেই নিজেকে প্রশ্ন করে- কেন অপেক্ষা করবে? চেনা নেই, জানা নেই একজন মানুষের সাথে কী এমন কথা থাকতে পারে? যাই হোক সেটা তার ব্যক্তিগত ব্যাপার। তবু এভাবে উপেক্ষা করে চলে আসাটা উচিত হয়নি। কী বলতে চায় শোনা উচিত ছিল। তাছাড়া হাবভাব দেখে খারাপ কিছুতো মনে হয়নি। যাক যা হবার হয়েছে। নিজেকে নিজে সান্ত্বনা দেয়ার চেষ্টা করে অনুসূয়া। আবার মনের মধ্যে উঁকি দেয় জীবনের মাঝে গেঁথে থাকা কষ্টগুলো; পুরুষদের বিশ্বাস করাটাই দুষ্কর। ওরা মেয়েদের শরীরটাকে সবচেয়ে বেশি চায়। তবে সব পুরুষ এক না-ও হতে পারে। কিন্তু কাকে বিশ্বাস করবো! নিজের জামাইবাবুর কথা মনে হতেই সকল তিক্ততা মুহূর্তেই ঝেঁকে বসলো।

মোটামুটি সবাই জানে যে, বিশ্ববিদ্যালয় হলগুলোতে খাবারের মান খুবই নিম্ন। তাছাড়া একই খাবার খেতে খেতে মুখের রুচিবোধ তিক্ততায় পূর্ণ হয়ে আসে। তাই মুখের রুচির পরিবর্তন করতেই অনুসূয়া তার দিদির বাসায় প্রায়ই গিয়ে হাজির হয়। অবশ্য দিদি এবং জামাই বাবুও খুব করে পীড়াপীড়ি করে। যার জন্য একটু বেশিই যাওয়া হতো। মাস তিনেক পূর্বের ঘটনা। বিশ্ববিদ্যালয় তিন দিনের বন্ধ থাকাতে দিদির বাসায় চলে আসে অনুসূয়া। দিদির বাসাতে ওর সময় সবসময়ই খুব ভালো কাটে। একদিকে দিদি যেমন আদর করে ও ভালোবাসে তেমনি জামাইবাবুও বেশ আদর ও স্নেহ করেন। দিদির নতুন সংসার। সবকিছু মিলিয়ে বেশ ভালোই চলছে ওদের। জামাইবাবু ভালো চাকুরী করেন। এবারের প্রথম দিনটা যথারীতি বেশ ভালোই কাটে। কিন্তু দ্বিতীয় দিনটা হয়ে যায় জীবনের এক কালো অধ্যায়; দিদি প্রতিবেশি এক আপুর সাথে শপিং-এ বেরিয়ে যায়। অবশ্য অনুসূয়াকেও যেতে বলেছিল।

সামনের সপ্তাহে পরীক্ষা আছে বিধায় অনুসূয়া বাইরে যায়নি। এদিকে জামাইবাবুও সন্ধ্যার আগে এসেই হাজির। কলিং বেল টিপতেই অনুসূয়া এগিয়ে গিয়ে দরজাটা খুলে দেয়। তাড়াহুড়ার মধ্যে ওড়নাটা নিতে একেবারে ভুলেই গিয়েছিল। জামাইবাবুর দৃষ্টিখানা উন্নত বুকখান এড়ায়নি। অনুসূয়া একটু জড়োসড়ো হয়ে নিজেকে গুঁটিয়ে নেয়। জামাইবাবু জানতে পারেন যে, অনুসূয়ার দিদি শপিং-এ গিয়েছে। ধীরে ধীরে জামাইবাবুর আবদার একের পর এক বাড়তে থাকে; এক গ্লাস জল দাও, এক কাপ চা করে দাও প্লিজ!- তারপর কম্পিত কন্ঠে জামাইবাবু বলেন- অনুসূয়া, তুমি কী খুব ব্যস্ত?

ভদ্রতা দেখিয়ে প্রতিদিনকার মতো সে বলে- না জামাইবাবু, আপনার আর কিছু লাগবে?
অচেনা কন্ঠস্বরে জামাইবাবু বলেন- আজ কাজের খুব বেশি প্রেসার গিয়েছে। মাথাটা ভীষণ ব্যথা করছে। চুলগুলো একটু টেনে দিতে যদি ভালো হতো।
অনুসূয়া জামাইবাবুর কন্ঠস্বরের মর্মার্থ বুঝতে পেরেও তেমন পাত্তা দেয়নি। কারণ সে জানে ওর জামাইবাবু নিখাদ একজন ভদ্রলোক। তাই এগিয়ে গিয়ে মাথার চুলে বিনুনি কাটতে থাকে। সেকেণ্ড যায়... মিনিট যায়... পনের মিনিটও পেরোয়নি অনুসূয়াকে জোর করে বুকের মধ্যে টেনে নেন।
অনুসূয়া কান্না করতে করতে জামাইবাবুর পায়ে লুটিয়ে পড়ে। কিন্তু কোন কাজ হয়নি। নিরুপায় হরিণীর মতো বাঘের থাবায় আটকে গেল। সব হারিয়ে অনুসূয়া একেবারে স্তব্ধ, নির্বাক ও পর্যুদস্ত।
অনুসূয়াকে আদর করতে করতে জামাইবাবু বলেন- তুমি এত ভেঙে পড়ো না। এটা স্বাভাবিক ব্যাপার। তাছাড়া তুমি আমার শ্যালিকা, এটুকু অধিকার তোমার ওপর আমার আছে। তুমি বিশ্বাস কর, এই তোমাকে ছুঁয়ে বলছি; এ ব্যাপারে কেউ কোনদিন কিচ্ছু জানতে পারবে না।
বেশ অবাক হয়েই জামাইবাবুর দিকে তাকায় অনুসূয়া এবং বেশ আশ্চর্য হয়েই ভাবে- অপরাধ করে আবার প্রচ্ছন্ন হুমকি দিচ্ছে। মনটা অবাধ্য হয়ে ওঠতে চাচ্ছে কিন্তু দিদির কথা ভেবে ছলছল চোখজোড়া অবনত করে নেয়। হাঁটুতে থুঁতনি গেঁড়ে অনুসূয়া মেঝেতে বসে রইল। ভেবে ভেবে কোন কূল-কিনারা পাচ্ছে না।
শোন অনুসূয়া, একদম স্বাভাবিক হয়ে যাও। তোমার দিদি যেন বিন্দুমাত্রও টের না পায়। টের পেলে তোমারই ক্ষতি হবে। তোমার ভালোর জন্যেই বলছি। একেবারে স্বাভাবিক হয়ে যাও। তোমার দিদি যে কোন সময় চলে আসতে পারে।– এই বলে জামাইবাবু তোয়ালে নিয়ে সরাসরি বাথরুমে চলে গেলেন।
নানান চিন্তা করে, বিশেষ করে দিদির কথা ভেবে অনুসূয়া নিজের মনটাকে শক্ত করে নেয়। হাত-মুখ ভালো করে ধুয়ে চুপচাপ পড়ার টেবিলে চলে আসে। সেই যে আসা আর এখন পর্যন্ত যাওয়া হয়নি দিদির বাসায়। প্রায় একমাস হ'তে চলল।
আজ কেন যেন কিংশুকের কথাগুলো কানের ভেতর রিনিঝিনি সুরে বারবার বেজে ওঠছে। পরক্ষণই আবার জামাইবাবুর চেহারা ভেসে ওঠে। একটা দ্বিধাদ্বন্দ্বের ভেতর দোল খাচ্ছে অনুসূয়া। কিন্তু কিংশুকের কথা বলা, চোখের দৃষ্টি কোথাও কোনরকম বিচ্যুতি দেখতে পায়নি। বিশেষ করে কেন যেন ওকে দেখতে অথবা এগিয়ে গিয়ে কথা বলতে ইচ্ছে করছে। অপেক্ষায় থাকবে বললো। অতঃপর নিজেই নিজের মনটাকে শাসন করে বলে- না, কোন পুরুষকেই আর বিশ্বাস করা যাবে না।– ভাবতে ভাবতেই ঘুমের রাজ্যে ডুবে যায় অনুসূয়া।

সকালে ঘুম থেকে উঠেই স্নানাহার সেরে ফেলল অনুসূয়া। ক্লাস সেই এগারোটায় অথচ অজানা এক মোহে এবং টানে নয়টা নাগাদ রুম থেকে বেরিয়ে আসে সে। হাকিমচত্বর পেরিয়ে একটু এগোতেই লাইব্রেরির কোণে দৃষ্টি চলে গেল। কিংশুক ঠিকই চুপচাপ বসে আছে। কাছে এগিয়ে আসতেই কিংশুক হাসি মুখে উঠে দাঁড়ায় এবং বলে- কেমন আছেন?
ভালো। আপনি?
হ্যাঁ ঈশ্বর ভালো রেখেছেন।
কুশলাদি বিনিময়, পরিচিত হওয়া... তারপর কিংশুক বলল- আপনার যদি তাড়া না থাকে তবে কিছুক্ষণ বসে কথা বলতে পারি। কী বলেন?- বলেই কিংশুক স্নিগ্ধ চোখে তাকিয়ে থাকে।
কোন কিছু না বলেই অনুসূয়া বারান্দার এককোণে বসলো। একটু দূরত্ব বজায় রেখে কিংশুকও বসল। কথায় কথায় জানা হলো দু'জন একই বর্ষের ছাত্রছাত্রী যদিও ডিপার্টমেন্ট আলাদা।
নিরুপমার কথা জানার পর অনুসূয়া কিংশুকের প্রতি আরও একটু নমনীয় এবং বন্ধুবৎসল হয়ে ওঠে। তারপর ঘন্টা, দিন, মাস পেরিয়েই ওরা টের পায় একজন অন্যজনকে অনুভব করে। একদিন দেখা না হলেই উভয়ই উৎকন্ঠায় থাকে।
লাইব্রেরির সামনে বসে প্রায়ই গল্প করে। মলচত্বরে বসে দু'জন একাকি আড্ডা দেয়। পাবলিক লাইব্রেরির চত্বরে প্রায়ই চলে দিনভর পড়াশুনা আর আড্ডা। নাটকপাড়া বেইলি রোডে নাটক দেখতে যায়। আর প্রায়ই চলে টি, এস, সি-এর ভেতরও ম্যারাথন আড্ডা চলে। কিংশুক যেন নতুন জীবন ফিরে পায়। আর অনুসূয়াও ভুলতে থাকে কালো অধ্যায়ের দুঃস্বপ্নটা।
কিন্তু সুনীল আকাশ বেশিক্ষণ সুনীল থাকে না। কখনওবা হালকা মেঘে আবার কখনও কালো মেঘে ছেয়ে যায়। অনুসূয়ার জন্মদিন উপলক্ষ্যে ওরা দু'জন সেই সকাল থেকে নানান জায়গায় ঘোরাঘুরি করে। শেষে ‰নীরব হোটেল' থেকে দুপুরের খাবার খেয়ে বের হয়। রিক্সা ডেকে উঠে বসেই কিংশুক রিক্সার হুডটা টেনে দিয়ে বলে- রোদটা ভীষণ কড়া লাগছে।
এখন দু'জন খুবই অন্তরঙ্গ হয়ে চাপাচাপি করে বসে আছে। কিংশুকের ভালোবাসার হাত দিয়ে অনুসূয়াকে একটু আগলে ধরে। অনুসূয়া অস্বস্তিবোধ করলেও মুখে কিছু বলেনি। কিছুদূর এগোতেই কিংশুক ফিসফিসিয়ে বলে- অনুসূয়া!- কন্ঠটা একটু কম্পিত মনে হচ্ছে।
অনুসূয়া কিংশুকের চোখে চোখ রাখে এবং জানতে চায়- বলো, কী বলবে।
তোমার জন্মদিনে তোমাকে একটা স্পেশাল গিফট দিতে চাই।
অনুসূয়া মুচকি হেসে চুপচাপ।
নীরবতায় সম্মতি মেনে কিংশুক বলে- তুমি চোখ জোড়া একটু বন্ধ করো, প্লিজ!
কোনকিছু না বলেই অনুসূয়া চোখ জোড়া বন্ধ করে একগাল হাসি ছড়িয়ে দেয়।
অনুসূয়ার দিকে তাকিয়েই কিংশুক আবেগপ্রবণ হয়ে যায়; দেখতে ঠিক নিরুপমার মতোই লাগছে। আচমকা ফিরে যায় সেই ফেলে আসা সময়ের সন্ধিক্ষণে। অনুসূয়ার গ্রীবায় হাত রেখে একখান উষ্ণচুমু বসিয়ে দেয়।
অনুসূয়া চমকভরা দৃষ্টিতে তাকালো। যেন আকাশ থেকে ছিটকে পড়লো সে। অভিমানী এবং রাগভরা চোখ জোড়া কিন্তু কিছু না বলে দৃষ্টি সরিয়ে নিলো।
তুমি রাগ করেছো অনুসূয়া?
কোন উত্তর নেই।
কিংশুক অনুসূয়াকে জড়িয়ে ধরা হাতটা চুপচাপ সরিয়ে নিয়ে আবারও জিজ্ঞেস করে- তুমি রাগ করেছো?
কোন জবাব নেই। আর অনুসূয়া মনে মনে ভাবে- পুরুষরা এমনই হয়। এক পা, দু'পা, তিন পা তারপর এগিয়ে আসে শরীরের দিকে।
হলের সামনে রিক্সাটা থামতেই অনুসূয়া কোন কথা না বলেই চলে যাচ্ছিল। কিংশুক পথ আগলে দাঁড়ায় এবং আবারও বলে- স্যরি অনুসূয়া!
অনুসূয়া বেশ রাগতঃ কন্ঠেই বলে- তোমরা সব পুরুষই এক। আমাকে তুমি ভুলে যেও।
স্যরি অনুসূয়া! আর কখনও এমন হবে না। তাছাড়া আমি তোমাকে ভালোবাসি।
বললামতো, তুমি আমাকে ভুলে যেও।
এটা কখনও সম্ভব নয়।
সবই সম্ভব। মনে করো এটা একটা স্বপ্ন ছিল।– আর কোন কথা না বলে অনুসূয়া চলে যায় হলের ভেতর। হঠাৎ যেন সময় থমকে গেল, কিংশুক ঠায় চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে। কতক্ষণ দাঁড়িয়েছিল খেয়াল নেই। তারপর বিষন্ন মনে হাকিম চত্বরে এসে বসে। মনের ভেতর কষ্টগুলো এখনও তোলপাড় করে চলেছে; সেই কখন থেকে নিজের সাথে নিজে যুদ্ধ করছে। কোনমতেই নিজেকে প্রবোধ মানাতে পারছে না। বারবার প্রতিবার মনের ভেতর স্বগোক্তি- বিশ্বাস করো অনুসূয়া, আমার মনের ভেতর কোন পাপ ছিল না। আকাশ, বাতাস আর আকাশের সব পাখিকে আমি চিৎকার করে জানিয়ে রাখছি- আমার মনে কোন পাপ ছিল না।

পরদিন। পড়ন্ত বিকেল। রোকেয়া হলের গেইটের পশ্চিম পাশে ডালপালাহীন মৃত গাছের গুড়ি ঘেঁষে কিংশুক চুপটি করে বসে আছে। এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে আবার কোথাও যেন তাকাচ্ছে না। মনে মনে শুধু একজনকে খুঁজছে। না, অনুসূয়া আসেইনি। ঘন্টা, দিন, সপ্তাহ পেরিয়ে গেল অনুসূয়ার দেখা নেই। দিনকে দিন কিংশুক কেমন যেন বেসামাল হয়ে যাচ্ছে। এত মন্দ হাওয়া মনের ভেতর এর আগে আর কখনও বয়ে যায়নি; মুক্তিযুদ্ধের সময়ও অনেক কঠিন সময় পেরিয়ে এসেছে, পেরিয়ে এসেছে নিরুপমার মৃতদেহ পড়ে থাকার দুঃসহ সময়। কিন্তু এখন যেন সবকিছুকেই ছাপিয়ে যাচ্ছে। মনে মনে ভাবে আবার একবার একটা খবর পাঠিয়ে দেখা যাক। নিজের পাথরসম দেহটাকে টেনে গেইটের সামনে এসে দাঁড়ায়- অনেক মেয়েই সামনে দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে। কিন্তু কাউকে কিছু বলতে সাহস পাচ্ছে না।
হঠাৎ চোখ পড়ে- একটা মেয়ে সাজগোজহীন। অতি সাধারণ দেখতে এবং তার মধ্যে কোন ব্যস্ততা নেই। কিংশুক এগিয়ে গিয়ে নম্রভাবে বলে- এক্সকিউজ মি!
মেয়েটি শব্দহীন ফিরে তাকায়। দৃষ্টিজোড়া জিজ্ঞাসা।
কিংশুক বলে- আপনি কি ব্যস্ত আছেন?
কেন বলুনতো?
আমার এক বান্ধবীকে একটু ডাকার দরকার ছিল।
রুম নম্বর এবং নামটা বলুন।
রুম নম্বর এবং নামটা বলতেই মেয়েটা বলল- ঠিক আছে, আপনি অপেক্ষা করুন। আমি খবরটা দিয়ে আসছি।
অশেষ ধন্যবাদ।– বলেই কিংশুক উদগ্রীব হয়ে অপেক্ষায় থাকে। আর মনে মনে ভাবে- এই শেষ আর কখনও না!- তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে আকাশের দিকে দুঃখে ভারাক্রান্ত দৃষ্টিটুকু মেলে দেয়।
মিনিট দশেকের মধ্যেই মেয়েটি ফিরে এল। একটা লম্বা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল- দাদা, মনে কিছু করবেন না।– কিংশুকের মায়াবী ম্লান চেহারাটা দেখে খুব মায়া হয় এবং মনে মনে ভাবে সত্যি কথাটাই বলা দরকার।
কিংশুক বিস্ময়ভরা চোখে তাকায়।
উনি রুমে আছেন। কিন্তু বলে দিয়েছেন যে, উনি রুমে নেই বলতে। এরপর মেয়েটি ইচ্ছে করেই বানিয়ে বানিয়ে আরও কিছু কথা বলল। অনুসূয়ার রুক্ষ ব্যবহারটা ওর ভালো লাগেনি। তাছাড়া কিংশুকের দিকে তাকাতেই ওর ভেতর যেন কেমন একটা মায়া মায়া হাওয়া বয়ে গেল।
তারপর টুকিটাকি কথাবার্তার ফাঁকে জানা গেল- মেয়েটির নাম নীলাঞ্জনা এবং এক বৎসর জুনিয়র।
তাহলে আপনাকে, কিংশুক'দা বলেই ডাকতে পারি নাকি?
হ্যাঁ অবশ্যই। আজ তাহলে আসি। ভালো থাকবেন।– এই বলে ঝড়ো হাওয়ায় বিধ্বস্ত পাখির মতো শরীরটাকে টেনে চললো কিংশুক। মনে হয় আর দেখা করবে না; প্রায় এক মাস হয়ে গেল! ভাবতে ভাবতেই লাইব্রেরির বারান্দার কোণে এসে বসল। যেখানে বসে অনুসূয়ার সাথে প্রথম কথা হয়েছিল। প্রতিদিনই এখানে বসে থেকে দৃষ্টি মেলে অপেক্ষায় ছিল অনুসূয়াকে দেখতে পাবার আশায়। কিন্তু এ পর্যন্ত আর দেখা পায়নি।
অনুসূয়া এখন আর এ পথে যাওয়া-আসা করে না। পথ পাল্টে কলাভবনের সন্মুখ গেইট দিয়ে চলাচল করে। তাছাড়া দূর থেকে সতর্ক দৃষ্টি রেখে অনুসূয়া চলাচল করে। ডিপার্টমেন্টেও গিয়ে ওর খোঁজ পায়নি কিংশুক।
নীলাঞ্জনা প্রায় সপ্তাহ খানেক ধরেই লক্ষ্য করছে- কিংশুক'দা একই জায়গায় প্রায় সারাদিনই বসে থাকে এবং একা একা। সদ্য পরিচিত তাই এতদিন কাছে এগিয়ে গিয়ে কথা বলা হয়ে ওঠেনি। আজ ফিরতি পথে লাইব্রেরির কাজ শেষে বারান্দা ধরে হেঁটে এগিয়ে চলে। কাছাকাছি এসে নীলাঞ্জনা বলে- নমস্কার কিংশুক'দা, কেমন আছেন?
ভাবনার জগৎ থেকে ফিরে আসতে কিংশুকের বেশ কিছুটা সময় লাগে। ঘোর লাগা চোখে একটু অবাক করা দৃষ্টি নিয়ে সে তাকায়।
নীলাঞ্জনা বুঝতে পেরে বলে- আমাকে চিনতে পারছেন না? আমাদের হল গেইটে কথা হয়েছিল।
ও হ্যাঁ, স্যরি... স্যরি... নীলাঞ্জনা। আপনি কেমন আছেন?
হ্যাঁ, ভালো আছি। মনে কিছু করবেন না, একটা কথা বলবো?
হ্যাঁ, নিশ্চয়ই বলুন।
তার আগে বলুন- আপনি আমাকে ‰আপনি' ‰আপনি' বলবেন না। আমি আপনার জুনিয়র। আমাকে তুমি করেই বলতে পারেন দাদা।
ঠিক আছে, হয়ে যাবে। দাঁড়িয়ে কেন? তাড়া না থাকলে বসতে পারো।
নীলাঞ্জনা কোন কথা না বলেই পাশাপাশি হয়ে বসল।
কাছ দিয়েই চা-ওয়ালা পিচ্চিটা যাচ্ছিল। কিংশুক ডাক দিয়েই আবার নীলাঞ্জনাকে বলল- চা চলবে তো?
নীলাঞ্জনা ভদ্রতা করেই বলল- আপনি যদি খান তবে খেতে পারি।
পিচ্চিটা কাছে আসতেই কিংশুক বলল- লাল চা হবে?
জ্বী হবে।
দু'কাপ দে।
দু'কাপ চা নিয়েই পিচ্চিকে বিদায় করলো। চায়ের কাপে চুমুক দিয়েই নীলাঞ্জনা কিংশুকের চোখে চোখ রাখে এবং বলে- আপনাকে সেই সকাল থেকেই এখানে বসে থাকতে দেখলাম।
কিংশুক অবাক এবং নিরুত্তর। চায়ের কাপে চুমুক দিতেও ভুলে গেছে।
স্যরি, রিয়েলি স্যরি, আপনাকে একান্ত ব্যক্তিগত প্রশ্ন করে ফেললাম।
ইটস ওকে নীলাঞ্জনা। তারপর কষ্টের একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে কিংশুক বলে- তুমি ঠিকই বলেছো। এখানে বসে থাকতে আমার খুব ভালো লাগে।
নীলাঞ্জনা ইচ্ছে করেই প্রসঙ্গ পাল্টায় এবং বলে- আজ ক্লাসে যাননি?
না, ভালো লাগছিল না। তাই এখানে বসেই কাটিয়ে দিলাম।– বলেই এক পলক নীলাঞ্জনার দিকে তাকায়- গায়ের রঙটা ঘষামাজা, কিন্তু দেখতে অপূর্ব। তাছাড়া কোনরকম সাজগোজ পর্যন্ত নেই; ঠোঁটে কোন লিপস্টিকের রঙ নেই। ওর সবকিছুতেই যেন প্রকৃতির ছোঁয়া। আর চুলগুলোতে যেন শান্ত মেঘের ছড়াছড়ি। নীলাঞ্জনা দৃষ্টি ফেরানোর আগেই কিংশুক দৃষ্টি সরিয়ে চাপের কাপে চুমুক বসায়।
কিংশুকের জন্যও নীলাঞ্জনার মনের আকাশটা কষ্টে ছেয়ে যায়। চোখের দিকে তাকালেই কষ্টগুলো আন্দাজ করা যায়। যেখানে ডুবে থাকা সন্ধ্যাতারা ঝিকমিকিয়ে ওঠে। ক'জনার ভাগ্যে জোটে এমন ভালোবাসা। অথচ অবজ্ঞার স্রোতে নির্জীব হয়ে আছে।– ভাবতে ভাবতেই নীলাঞ্জনা একটু আবেগপ্রবণ হয়ে ওঠে। নিজেকে সামলে নিয়ে বলে- দাদা, সন্ধ্যা হয়ে এলো। আমি এখন উঠতে চাচ্ছি।
হ্যাঁ, অবশ্যই। তোমার সাথে কথা বলে ভালোই লাগলো নীলাঞ্জনা। এসো... ভালো থেকো।
আসি... আপনিও ভালো থাকবেন।
কিংশুক অবাকভরা দৃষ্টি নিয়ে নীলাঞ্জনার চলে যাওয়া পথের দিকে তাকিয়ে থাকে।
*
নদী পথের গতি যেমন থেমে থাকে না তেমনি মানুষের জীবনও কখনও থেমে থাকে না। সময় আপন গতিতে এগিয়ে চলে এবং সময়ের সাথে সাথে প্রতি বসন্তে মানুষের মন বদলায়। ক'জন পুরুষ আর কাকজীবনে কাটায় বা কাটাতে পারে অথবা কাকজীবনে ডুবে থাকে। যেমন কিংশুক পারেনি। নিরুপমার ছায়ায় খোঁজে নিয়েছিল অনুসূয়াকে। আবার এখন অনুসূয়ার হারিয়ে যাওয়া প্রেক্ষাপটে নীলাঞ্জনা কিংশুকের মনের বাগানে গোলাপ হয়ে ফুটে ওঠল। এখন মনের বাগানটা আবারও বসন্তের ছোঁয়ায় যেন প্রাণবন্ত হয়ে ওঠেছে। তবে মনের ভেতরকার আঁচড়গুলো মাঝে-মধ্যে খচখচ করে ওঠে। সব ছাপিয়ে কিংশুক এখন অন্য এক নতুন প্রাণবন্ত মানুষ।কেউ দেখে বুঝতে পারবে না যে, দিনের পর দিন, রাতের পর রাত প্রতিটিক্ষণ কষ্টের সমুদ্রে হাবুডুবু খাওয়া একজন মানুষ সে।
ওরা এখন টি,এস,সি-এর সবুজ চত্বরেই বেশি বসে। একসঙ্গে লাইব্রেরিতে যায়, নাটক দেখে আর নানান জায়গায় ঘোরাঘুরি। জীবন এখন স্বাভাবিক এবং সুন্দর। দু'জন চুপচাপ বসে আছে। নীরবতা ভেঙে নীলাঞ্জনা বলে- আমার মনে হয় তুমি কিছু একটা নিয়ে খুব ভাবছো এবং চিন্তিত।
তেমন কিছু না। আজ সন্ধ্যায় আমার মা-বাবা ঢাকায় আসছেন।
নীলাঞ্জনা অবাক হয়ে তাকায়।
না, তেমন কিছু না। দু'জনকে ডাক্তার দেখাতে হবে।
মেজর কোন সমস্যা?
না, তেমন কিছু না। রেগুলার চেকআপ বলতে পারো। আমি ভাবছি।– এই বলে কিংশুক নীলাঞ্জনার দিকে তাকায়। নীলাঞ্জনাও চোখে চোখ রাখে।
আমি ভাবছি মা-বাবার সাথে তোমাকে পরিচয় করিয়ে দেবো। তোমার আপত্তি নেই তো?
আমার কোন আপত্তি নেই। বরং খুব ভালো লাগবে।
যাক, আমাকে শিন্তামুক্ত করলে।
তারপর দু'জন চায়ের কাপে শেষ চুমুক দিয়ে টিএসসি থেকে বেরিয়ে এলো।

বেশ প্রসন্নচিত্তেই কিংশুক মা-বাবাকে নিয়ে আসে রোকেয়া হলের পাশের যাত্রীছাউনির কাছে। মা-বাবাকে বসার জন্য কাগজ বিছিয়ে দেয়।
কিংশুকের মা একটু ইতস্ততঃ করছিল বসতে গিয়ে। বুঝতে গিয়ে কিংশুক বলল- মা, ওই আশেপাশে তাকিয়ে দেখ। তোমার মতো আরও অনেকে এসেছেন এবং বসেছেন। লজ্জার কিছু নেই।
বসতে বসতেই নীলাঞ্জনা এসে হাজির। আসার সাথে সাথে কিংশুক ওর মা-বাবার সাথে পরিচয় করিয়ে দিল।
মা আবারও জিজ্ঞেস করলেন- তোমার পুরো নামটা কী মা।
নীলাঞ্জনা ব্যানার্জী।
নামটা শুনেই কিংশুকের মা-বাবা পরস্পরের দিকে তাকিয়ে থাকে। নীলাঞ্জনা আড়ষ্টতা ভেঙে যেই-না কিংশুকের মা-বাবাকে প্রণাম করতে যাবে অমনি দু'জনই একসঙ্গে বলে ওঠে- একি করছো মা! তুমি ব্রাহ্মণ ঘরের সন্তান। তোমাদের প্রণাম নেয়া আমাদের পাপ!
কিংশুক স্বাভাবিক কন্ঠেই বলে- তা'তে কী হয়েছে? ও তোমাদের সন্তানের মতো।
নীলাঞ্জনা বলে- কিংশুক ঠিকই বলেছে।
কিংশুকের বাবা বলেন- সন্তানের মতো ঠিক আছে। কিন্তু ব্রাহ্মণের প্রণাম নেয়া আমাদের পাপ। নরকে যেতে হবে।
এবার কিংশুক বলে- বাবা, তুমি আমি সকলেই ব্রাহ্মণ হতে পারি। যার ব্রহ্ম জ্ঞান আছে সেই ব্রাহ্মণ।
মা বলতে থাকেন- যতকিছুই বলিস, আমরা পাপী হতে পারবো না।
নীলাঞ্জনা কিংশুকের কথায় তাল মিলিয়ে বলে- কিংশুক ঠিকই বলেছে কাকীমা।
নাছোড়বান্দা মা-বাবার সাথে আর কথা বাড়ায় না কিংশুক; জানে ওদের সাথে তর্ক করে লাভ নেই। ওরা অন্ধ বিশ্বাসের বলি। এবার প্রসঙ্গ পাল্টে বলে- মা, কী খাবে বলো?
মা আশ্চর্য এবং লাজুকভরা দৃষ্টিতে নীলাঞ্জনার দিকে তাকায়। নীলাঞ্জনা বুঝতে পেরে বলে- কাকীমা, এখানে লজ্জা করবেন না। অনেকের মা-বাবাই আসেন, বসেন, খান। তারপর কিংশুকের দিকে তাকিয়ে বলে- এক কাজ করো, চারটা আইসক্রীম নিয়ে এসো।
কোন কথা না-বলেই কিংশুক চলে যায় আইসক্রীম আনতে। এবং মুহূর্তেই ফিরে আসে। হাতে চারটি আইসক্রীম।
ছেলে-মেয়েদের সাথে বেশ আনন্দের সময়ই কাটালেন। এখানকার প্রাণবন্ত পরিবেশ দেখে উনারা সত্যিই আপ্লুত। যাবার সময় মা বলে গেলেন- মা নীলাঞ্জনা, ভালো থেকো।
কিংশুক একটা অটো ডেকেই মা-বাবাকে নিয়ে চেপে বসলো। নীলাঞ্জনা মন খারাপের হাওয়ায় ভেসে বিদায় নিয়ে হলের ভেতর পা বাড়ায়। সন্ধ্যা নেমে আসে।

আহারে জীবন! বিরহ যার কপালে আঁকা কেমনে হবে তার প্রেমিকার সনে চিরদেখা। প্রেমিকার সনে হয় যে দেখা বসন্ত বাগানে আবার বাগান ভেঙে খান খান ঝড়ো হাওয়ার তাণ্ডবে। বাগানে বাগানে ঘোরাঘুরি, ওড়াউড়ি আবার হয় শুরু সুখের কলতান। আবার ভাঙে সকল সুর শরতের আকাশ হয় ম্লান। দু'গালে হাত চেপে কিংশুক অন্যমনস্ক হয়ে লাইব্রেরির বারান্দার দক্ষিণ কোণেই বসা।
বাসায় ফিরেই মা-বাবার এক কথা ওই মেয়েটা ব্রাহ্মণ। যা'ই করো আর না-করো কিন্তু ওকে বিয়ে করা চলবে না। তাহলে চৌদ্দপুরুষ নরকে যাবে। কে বুঝাবে কাকে- মানুষ তো মানুষই! যার যে শিক্ষা তা' সে পাবেই। তার অধিক বৈ কিছুই নয়। কিন্তু মা-বাবা নাছোড়বান্দা। কিংশুক নিরুপায় হরিণীর মতো ছটফট করে- এপাড়-ওপাড় কোনপাড়ই ছাড়তে পারছে না। ঝড়ো হাওয়ায় মাঝ আকাশে আটকে পড়া পাখির মতো ক্লান্ত। প্যাকেট থেকে একটা সিগারেট নিয়ে তাতে আগুন লাগিয়েই বসালো লম্বা একখান টান। ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বাতাসে বাতাসে মনের কষ্টগুলোকেও ছড়িয়ে দেয়ার চেষ্টা করে কিংশুক। কিন্তু না! কিছুতেই মনটা শান্ত হচ্ছে না।
নীলাঞ্জনা কখন এসে পাশে বসেছে তা' একদমই টের পায়নি। অসহায় দৃষ্টি মেলে কিংশুক নীলাঞ্জনার দিকে তাকায়- চোখ জোড়ায় হাজারো রকমের প্রশ্ন।
কী ব্যাপার কিংশুক! তোমাকে এত বিচলিত দেখাচ্ছে কেন?
না, তেমন কিছু না। বসো প্লিজ!
কিংশুকের গা ঘেষেই নীলাঞ্জনা বসে।
বিস্তারিত শোনার পর নীলাঞ্জনা বেশ শান্ত হয়েই বলে- কিংশুক ওসব নিয়ে চিন্তা করো না। দেখবে, সময়ে সবই ঠিক হয়ে যাবে।
একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে কিংশুক বলে- আমার মনে হয় না। এত সহজে ব্যাপারটা মিটমাট হবে না।
বললামতো ওসব নিয়ে কোন চিন্তা করো না। সময়ে সবই ঠিক হয়ে যাবে।
কিন্তু হাওয়া বদলের সাথে সাথে কিংশুক নিজেকেও বদলে নেয়। ধীরে ধীরে ভালোবাসা নামক পৃথিবী থেকে সে নিজেকে ধীরে ধীরে লীন করে। সকল ভালোলাগাকে সে আর ভালোলাগায় বাঁধে না। সবার কাছেই নিজেকে অপ্রিয় করে তোলে ইচ্ছের বিরুদ্ধেই। বসন্ত বাগানের গোলাপে তাকায় না, কিংবা শরতের আকাশে ভেসে থাকা সাদা মেঘে দৃষ্টি মেলে দেয় না; সবকিছুই কিংশুকের কাছে এখন সাধারণ।
অসাধারণের মাঝেও কিছু কিছু বিষয় অতি সাধারণের মতো আজীবন মনে গেঁথে থাকে। তেমনি নিরুপমা কিংবা অনুসূয়া অথবা নীলাঞ্জনা কিংশুকের মনের ভেতর কুঠুরীতে গেঁথে আছে- অথচ ওদের বসবাস যোজন যোজন আলোকবর্ষে।
নীলাঞ্জনার চোখের জল একাকার হয়ে গেছে কিংশুকের দুঃখ কিংবা কষ্টের সাগরের নীল জলে। এই সাগরে প্রতিনিয়ত সাঁতরে বেড়ায় কিংশুক। জীবনের পরতে পরতে গেঁথে আছে ফেলে আসা প্রেমিকাদের ছন্দগুলো।
এখনও কথা হয় নিরুপমার সাথে মনের ভেতর হেঁটে হেঁটে, অনুসূয়ার ছায়ায় ছায়ায় সে হাঁটে আর নীলাঞ্জনার কষ্টগুলোকে বুকের ভেতর লালন করে। এক বুকেই সকল প্রেমিকাদের ভালোবাসা সাজিয়ে রেখেছেন কিংশুক। আর সকল ফুলের বাগান হলো সূক্তিপ্রিয়া। ক্ষণে ক্ষণে প্রতিদিনে সকল ফুলের সুবাস ছড়িয়ে দেন সূক্তিপ্রিয়ার মন বাগান জুড়ে।
ঘুমের ঘোরেই সূক্তিপ্রিয়া কিংশুক বাবুকে জড়িয়ে ধরেন। কিংশুক বাবু আরও কাছাকাছি হয়ে বুকের ভেতর টেনে নেন ভালোবাসার মানুষটিকে অথবা প্রেমিকাদের।